বিনোদবিহারী মুখোপাধ্যায়

স্মরণ



কলাভবন, বিশ্বভারতী ॥ শান্তিনিকেতন

Scanned with CamScanner

Scanned with CamScanner

বিনোদবিহারী মুখোপাধ্যায়

(১৯০৪-২০০৪)

স্মরণ

কলাভবন, বিশ্বভারতী
শান্তিনিকেতন

Scanned with CamScanner

প্রকাশ : ফেব্রুয়ারি ২০০৫

প্রকাশক : কলাভবন, বিশ্বভারতী, শান্তিনিকেতন
মুদ্রক : দি ভার্চুয়াল ওয়ার্ল্ড, বোলপুর।

Scanned with CamScanner

নিবেদন

কলাভবনে বর্তমান ছাত্রছাত্রীরা বিনোদদাকে দেখেন নি। এমনকি আমার অনেক সহকর্মী আছেন যাঁরা বিনোদদাকে দেখেননি। আমি বিনোদদাকে দেখেছি, কথা বলেছি, এমনকি বিনোদদার কাছে শিল্প ইতিহাসের পাঠ নিয়েছি। আমার অতিরিক্ত পাওনা, সৌভাগ্য ও গর্বের বিষয় এটি। বিনোদবিহারী মুখোপাধ্যায় প্রসঙ্গে প্রস্তাবনার শুরুতে 'আমার' কথার প্রাসঙ্গিকতা, একটি বাতাবরন এবং ঐ সময়ের কলাভবনকে স্মরণ করার মধ্যেই সীমাবদ্ধ।

১৯৬৮ সালের জুলাই মাসের কোনো এক সময়ে কলাভবনে ভর্তি হয়ে প্রথম দিনেই ছাত্রাবাসে বারান্দা জুড়ে যে দেওয়ালচিত্র দেখেছিলাম তা বিনোদদাময়। বিনোদদার দেওয়ালচিত্র ছাত্রাবাস থেকে কলাভবনের স্টুডিও এলাকায় সম্প্রসারিত - ফলে সেই দেখার যোগ অদ্যাবধি।

আমাদের সৌভাগ্য বিনোদদার জন্মশতবর্ষ উদ্‌যাপনের কর্মকাণ্ডে আমরা নিজেদের নিয়োগ করার সুযোগ পেয়েছি। এমনকি শতবর্ষ পালনের আর্থিক দায়ভার কলাভবনের শিল্পীশিক্ষককূল স্বতস্ফুর্ত ভাবে মিলিত প্রচেষ্টায় সংগ্রহ করেছেন। আর্থিক দায়ভারের প্রচলিত পদ্ধতি - সরকার বা বিজ্ঞাপনলব্ধ অর্থ - থেকে মুক্ত রাখতে পেরেছি। নিজ অর্জিত অর্থের সাহায্যে একাধিক পরিকল্পনা গ্রহণের মধ্য দিয়ে মনে হয় যেন আত্মিক যোগ আরো দৃঢ় হল। আমার যেটুকু জানা আছে শতবর্ষ পালনে বা এই ধরনের কর্মকাণ্ডে এমন প্রচেষ্টা এর আগে হয়নি।

বিনোদদার শতবর্ষ উদ্‌যাপনের একাধিক অনুষ্ঠানের মধ্যে বাংলা ভাষায় লেখা প্রবন্ধ সংকলনের মধ্য দিয়ে একটি পূর্ণাঙ্গ গ্রন্থ প্রকাশনার ভাবনা নিঃসন্দেহে অন্যতম ও স্বতন্ত্র। শিল্পচর্চার ক্ষেত্রে শিল্পের ইতিহাস বা শিল্পতত্ত্বের বাংলা গ্রন্থের অভাব আমরা মর্মে মর্মে অনুভব করি। কি দেশি কি বিদেশী শিল্প ইতিহাস ও শিল্পতত্ত্বের বই মূলত ইংরেজি ভাষায় লিখিত। ভারতীয় আঞ্চলিক ভাষায় প্রকাশিত এই ধরনের গ্রন্থের সংখ্যা নগন্য, এমনকি কোনো কোনো আঞ্চলিক ভাষাতে একটিও নেই। এ আমাদের লজ্জা।

Scanned with CamScanner

১৮৭৪ সালে শ্যামাচরণ শ্রীমানীর 'সূক্ষ্ম শিল্পের উৎপত্তি ও আর্য্যজাতির শিল্প-চাতুরি' প্রকাশনার মাধ্যমে বাংলা ভাষায় শিল্পালোচনার ভাবধারা, প্রস্তাবনা, সম্ভাবনার যে সাহস ও দুরদর্শিতা সূচিত হয়েছিল তার সর্বাঙ্গীন উৎকর্ষ সাধন ঘটেছিল বিনোদদার বাংলা ভাষায় লেখা একাধিক প্রবন্ধ ও গ্রন্থ প্রকাশের মাধ্যমে। আজ বিনোদদার জন্মশতবর্ষ পালনের অঙ্গরূপে বাংলাভাষায় লিখিত প্রবন্ধ সম্বলিত গ্রন্থ প্রকাশনার ঘটনা নিঃসন্দেহে তাৎপর্যপূর্ণ। এই গ্রন্থটিতে বিনোদবিহারী সম্পর্কিত কিছু প্রবন্ধ, তাঁর আঁকা ছবির প্রতিলিপি ছাড়াও রইল শিল্প সংস্কৃতি বিষয়ক লেখা। এই উদাহরণ পূর্ণরূপে ফলপ্রসু হবে যদি পরবর্তীকালে এই ধরনের প্রচেষ্টার তাৎপর্য আমরা অনুভব করি।

বিনোদবিহারী মুখোপাধ্যায় জন্মশতবর্ষ উদ্‌যাপন সমিতির পক্ষ থেকে আমি ধন্যবাদ জানাই সংকলক মহাশয়কে। অবশ্যই ধন্যবাদ যাঁদের লেখায় সমৃদ্ধিলাভ করেছে এই গ্রন্থটি। এবং যাঁরা এই গ্রন্থটি প্রকাশনায় প্রত্যক্ষ ও পরোক্ষ সাহায্য করেছেন তাঁদের সকলকে জানাই কৃতজ্ঞতা।

নির্মলেন্দু দাস
অধ্যক্ষ, কলাভবন
বিশ্বভারতী
শান্তিনিকেতন

Scanned with CamScanner

সূচীপত্র

Scanned with CamScanner

ভূমিকা

শতবর্ষ কত বছরে হয় অথবা কতবার হয় – এমন প্রশ্ন ভুল, অপ্রাসঙ্গিক মনে হবারই কথা। তবে শুনেছি বিশিষ্ট এক ভারতীয় সঙ্গীত শিল্পীর জন্মশতবর্ষ পালিত হয়েছিল তিনবার – দু'বার জীবিত অবস্থায় একবার মৃত্যুর পর। অষ্টআশি বছরের বৃদ্ধ বিজ্ঞানী মনে করতে পারেন তাঁর জীবন এক শতাব্দী সম্পূর্ণ করেছে অথবা বলতে পারেন পদার্থবিদ্যার বিংশ শতাব্দী শুরু হয়েছিল ১৮৯৭সালে। একই যুক্তিতে বলা যায় ঊনবিংশ শতাব্দীর কোনো এক সময়ে ইয়োরোপে জন্ম নিয়েছিল মডার্নিজম্ অর্থাৎ সংস্কৃতির বিংশ শতাব্দী।[১] আবার এক জাপানি চিত্রপরিচালক মনে করেন মেইজি যুগের জাপানি শিল্পী তেসাই তোমিওকা আশি বছর পার করার পর যে ছবি এঁকেছিলেন তা তাঁর আগের আঁকা অজস্র ছবির থেকে অনেক উন্নত মানের। আর তাই বলেন –"I am now seventy seven years old and am convinced that my real work is just beginning"।[২] কোনো মানুষের প্রকৃত শিল্পী হয়ে ওঠার মুহূর্তকে ধরেও তো অঙ্ক কষতে পারি আমরা শতবর্ষের।

শতবর্ষ যেমন কোনো এক মানুষের, প্রতিষ্ঠানের অথবা মানসিকতার বৃত্ত সম্পূর্ণ করাকে চিহ্নিত করে তেমনই সেই মানুষ, প্রতিষ্ঠান বা মানসিকতাকে স্মরণ করারও উপলক্ষ। স্মরণ কোনো সম্পূর্ণতাকে চিহ্নিত করে না, স্মরণ কোনো কিছুর সমাপ্তি ঘোষণা করার অনুষ্ঠান নয়। স্মরণ আমাদের জীবনচর্যাকে সমৃদ্ধ করার, সজীব রাখার প্রক্রিয়া।

এই বছর শিল্পী বিনোদবিহারী মুখোপাধ্যায়ের, সময়ের হিসেবেই জন্মশতবর্ষ। এই উপলক্ষে কলাভবন নানান অনুষ্ঠানের উদ্যোগ নিয়েছে - বাংলা প্রবন্ধ সংকলন তারই মধ্যে একটি। বিনোদবিহারী তাঁর সমস্ত সক্রিয় জীবন জুড়ে আন্তরিক ভাবে অনুধাবন করতে চেয়েছেন সমস্ত বিশ্বের শিল্পচর্চার গতিবিধি। শুধু তাই নয়, বাংলা ভাষায় তা লিপিবদ্ধ করেছেন বিভিন্ন সময়ে লেখা অজস্র প্রবন্ধে। সেই প্রক্রিয়ায় তৈরি হয়েছে মূল্যবান একটি শিল্পতত্ত্ব আর নিরাসক্ত স্বতন্ত্র এক বাচনভঙ্গী। নন্দলালের ঘনিষ্ঠতা সত্ত্বেও তাঁর ছবি যেমন পেয়েছে স্বতন্ত্র রূপ, রবীন্দ্রনাথের প্রতিষ্ঠানে বড় হওয়া সত্ত্বেও তাঁর সাহিত্যচর্চা তেমনই পেয়েছে এক নতুন মাত্রা।

---

১ Arthur C. Danto, 'Of Time and the Artist', *The Nation*, June 7, 1999.
২ Akira Kurosawa, "Let us hold out together . . . ", *Chaplin Film Magazine*, The Swedish Film Institute, 1988.

Scanned with CamScanner

বাংলায় শিল্পালোচনার ক্ষেত্রে বিনোদবিহারীর অবদান খুবই গুরুত্বপূর্ণ ও মূল্যবান বলে আমরা মনে করি।

এই সংকলন তাই স্মৃতিচারণ ও পুনর্মুদ্রণের মত দুটি গুরুত্বপূর্ণ বিষয় থেকে সরে এসে বেশি মনোযোগী হয়েছে পুনর্দর্শনে। সংকলনের প্রথম অংশে রইল বিনোদবিহারী সংক্রান্ত কিছু লেখা। যাঁরা লিখেছেন তাঁদের বেশির ভাগই ব্যক্তিগতভাবে পরিচিত ছিলেন না বিনোদবিহারীর সঙ্গে। বিনোদবিহারীকে তাঁরা বুঝে নেবার চেষ্টা করেছেন আজকের সংস্কৃতিচর্চার পরিপ্রেক্ষিতে কেবলমাত্র তাঁর কাজের মধ্যে দিয়ে। দ্বিতীয় অংশে রইল সংস্কৃতি জগতের বিভিন্ন উপাদান সংক্রান্ত আলোচনা। স্মৃতি আর স্মৃতি-বিস্মৃতির আলোচনা স্বাভাবিক কারণেই অনেকটা জায়গা জুড়ে রইল এই অংশের। বিভিন্ন সময়ে বিভিন্ন উপলক্ষে আঁকা বিনোদবিহারীর কিছু ছবি দিয়ে সাজানো হল এই বই – এই সংকলনের একমাত্র পুনর্মুদ্রণ।

বিনোদবিহারী শিল্পচর্চা করেছেন ভারতবর্ষের এমন এক যুগে যখন সাম্রাজ্যবাদ বিশ্বের বিভিন্ন প্রান্তে প্রতিষ্ঠিত করেছে তাদের আধিপত্য। পশ্চিমের শ্রেষ্ঠত্ব প্রতিষ্ঠা করার প্রক্রিয়ায় শুকিয়ে যাচ্ছে আঞ্চলিক স্বাধীন সংস্কৃতি চর্চা। যদিও ভারতবর্ষে সংস্কৃতির সংকীর্ণ কিছু ক্ষেত্র মুক্ত থাকতে পেরেছিল এর প্রভাব থেকে – শাস্ত্রীয় সঙ্গীতচর্চা যার অন্যতম – শিল্পচর্চা ছিল না মুক্ত। এই রকম এক ভারতবর্ষে আরো অনেকের সঙ্গে বিনোদবিহারী প্রতিষ্ঠা করেছিলেন শিল্পকলার স্বাধীন ভারতীয় রূপ। আর এই শিল্পচর্চার অঙ্গ হিসেবে উঠে এসেছিল সমকালীন ভারতীয় এক শিল্পতত্ত্ব। অনেকদিন পরের আজকের ভারতীয় সংস্কৃতিও আবার সাম্রাজ্যবাদের নতুন চেহারার মুখোমুখি দাঁড়িয়েছে। পথ হারানোর, বিভ্রান্ত হবার অবকাশও অনেক। এই সংকলন যদি সেই সংকট থেকে মুক্ত হবার চর্চায় সঙ্গী হতে পারে আর বাংলা ভাষায় সংস্কৃতি আলোচনার ধারাকে সজীব রাখতে সাহায্য করতে পারে তাহলে সেই হবে বিনোদবিহারীর প্রতি আমাদের শ্রদ্ধা জ্ঞাপন।

লেখা পাব জেনেও লেখা না পেয়ে যেমন অসহায় বোধ করেছি তেমনই যে কোনো কাজে আনন্দ পাবার প্রত্যয়ে উৎসাহিত করেছেন বহু মানুষ। তাঁদের সকলকে কলাভবনের পক্ষ থেকে আন্তরিক কৃতজ্ঞতা জানাই।

পুলক দত্ত

সংকলক, বাংলা প্রবন্ধ সংকলন

ফেব্রুয়ারি ২০০৫ বিনোদবিহারী মুখোপাধ্যায় জন্মশতবর্ষ উদ্‌যাপন সমিতি, কলাভবন

আঁধারে মোর তোমার আলোর জয়

শিবাদিত্য সেন

"আমার জগতে যে আলো আছে, সেই আলোতে এই সব আমি করতে পারি।" কত্তামশাই

সমাবর্তন শব্দটার একটা অর্থ প্রত্যাবর্তন, একটা অর্থ আবর্তন সম্পূর্ণ করা। এই আবর্তন লোকে নানা ভিন্ন কারণে নানাভাবে করে। পরিবেশ ভাবনার মানুষ ফিরে যান গান্ধীর কাছে। সুব্রামণ্যন বারে বারে ফিরে যান নন্দলালে, অমর্ত্য ফিরে দেখেন রবীন্দ্রনাথকে। দীর্ঘ ব্যবধানে আলোকচিত্রী স্টিফ মাককুরি আবার ফিরে যান আক্ষরিক অর্থে নাম না জানা ধাম না জানা সেই আফগান মেয়েটির কাছে, কুড়ি বছর আগে পাকিস্তানের কোনো এক উদ্বাস্তু শিবিরে যার যুদ্ধতাড়িত দুই চোখ তাঁকে চমকে দিয়েছিল। শুনছি সত্যজিতের "পথের পাঁচালী"র পঞ্চাশ বছর পূর্তিতে আর একটা ফিরে দেখা হবে।

ছোটোবেলা থেকে শুনে এসেছি কোনো বিশ্ববিদ্যালয়ের সব থেকে বড় উৎসবের নাম সমাবর্তন। অভিধান অনুযায়ী সেইখানে ছাত্র তার পাঠের স্বীকৃতি পায়, গুরুর আশীর্বাদ পায়, তার পর সংসারে ফিরে যায়। বিশ্বভারতীর সমাবর্তনে আমরা একটি আবাহন সংগীত শুনি - শুধু সেইদিনের উৎসবে নয়, বিশ্বভারতীর কর্মযজ্ঞে আহ্বান সেই গানে ব্যক্ত। গানটি হোল "বিশ্ববিদ্যাতীর্থপ্রাঙ্গণ কর' মহোজ্জ্বল আজ হে"। যে গানটি গাওয়া হয়, তার পূর্ণরূপটি গীতবিতানে নেই, আছে স্বরবিতানে।

বিশ্বভারতীর করণ ভবন নিয়ে যখন অনেক আলোচনা আর বিতর্ক, পাশাপাশি নানান ক্লেদের প্রকাশ তখন ঐ গানটিকে ফিরে দেখার কৌতুহল হল (হয়তো সেটাও একটা সমাবর্তনের টান) গানটির শুরুতে আছে অন্ধকার শেষে জ্যোতির দিকে যাত্রার কথা, তার জন্য প্রস্তুতির কথা। এই ভাষা আমাদের পরিচিত। সেই যাত্রায় আহ্বান করা হচ্ছে স্বাভাবিক ভাবেই কর্মীকে, জ্ঞানীকে, শুধু বাড়তি হয়তো মনে হয় জনকল্যাণধ্যাণীর মত একটা focussed mind এর আবাহন, বিশ্বভারতীর একটা দিক নির্দেশ তাতে নিহিত আছে। কিন্তু খটকা লাগলো একটা শব্দ বীর ধর্ম-এ এসে (বীরধর্মে পুণ্যকর্মে বিশ্বহৃদয়ে রাজ' হে)। এই বীরধর্মের আবাহন

Scanned with CamScanner

কেন ? এই শব্দটা তো ততো অনিবার্য মনে হয় না ? একটা বিশ্ববিদ্যালয়ের সঙ্গে কী তার সম্পর্ক ?

বীরধর্মের কথা ভাবতে গিয়ে ভাবতে হয় আমাদের কাছে বীরের গুণগুলি কী ? প্রথমেই মনে আসে সাহসের কথা আর তখন মনে পড়ে এই গানটিই তো প্রথম নয় - আরেকটি গানেও আরো আগে রবীন্দ্রনাথ এনেছিলেন ভয়হীনতার কথা। আজ থেকে একশো তিন বছর আগে বিশ্বভারতীর বীজ যেদিন বোনা হোল আশ্রম বিদ্যালয়ের প্রতিষ্ঠার মধ্যে দিয়ে, ৭ই পৌষের সেই দিনটিতে রবীন্দ্রনাথ একটি গান লিখেছিলেন -"মোরা সত্যের 'পরে মন আজি করিব সমর্পণ";এই গান সংকল্প সঙ্গীত নামে পরিচিত। এই গানে আছে -

যদি দুঃখে দহিতে হয় তবু নাহি ভয়, নাহি ভয়।
যদি দৈন্য বহিতে হয় তবু নাহি ভয়, নাহি ভয় ।
যদি মৃত্যু নিকট হয় তবু নাহি ভয়, নাহি ভয় ।

আমরা দেখি এই গানের 'কর্তা' আমি নয় 'মোরা', এই মোরা বলতে শুধু ছাত্রদের কথা কবির মনে এসেছিল এরকম ভেবে নেবার কোনো কারণ দেখি না। এই 'মোরা'য় একত্রিত খুব সম্ভব ছাত্র কর্মী শিক্ষক তথা পুর উদ্যোগটাই।

সাহসের প্রসঙ্গে ফিরে আসি - এই সাহস কার সাহস ? আমরা প্রথমেই ভাবি কর্মী মানুষের কথা। রবীন্দ্রনাথও বলেছিলেন এক রুদ্র মানবের কথা

"মৃত্যুর গ্রন্থি থেকে ছিনিয়ে ছিনিয়ে
সে উদ্ধার করে জীবনকে।" (পত্রপুট)

আমাদের মনে পড়ে রোনাল্ড্ রসের মত মানুষকে, তিনি তো এই জীবনকে উদ্ধার করার কাজেই নিজের প্রাণ দিয়েছিলেন, মৃত্যু শুধু তাঁর নিকটে আসেনি, তাঁকে গ্রাস করেছিল। রোনাল্ড্ রস্ কিন্তু প্রাথমিকভাবে সমাজকর্মী নন, তিনি আরোগ্য গবেষক। জ্ঞানের জগতে সাহসের কথা আমাদের কালে আমাদের কাছে সবথেকে স্পষ্ট করে বললেন তো রবীন্দ্রনাথ, বললেন অচেনার মুখোমুখি হবার সাহসের কথা, বললেন

সত্য যে কঠিন
কঠিনেরে ভালোবাসিলাম।

Scanned with CamScanner

এই সত্যে পৌঁছুবার যে সহজ পথ নেই সেটাই বার বার বলেছেন। আমরা পেয়েছি এক নারীকে, রাজা নাটকের সুদর্শনা, যে এক প্রবল ঝঞ্ঝার শেষে উপলব্ধি করে, যা শ্রেয় তা সহজ সুন্দর নাও হতে পারে - তখন সে বলে "যাবার আগে আমার অন্ধকারের প্রভুকে, আমার নিষ্ঠুরকে আমার ভয়ানককে প্রণাম করে যাই।" সেই সূত্রে আবু সৈয়দ আয়ুব বলছেন "রাজাকে পেতে হলে . . . , সত্যের মুখোমুখি দাঁড়াবার মত চারিত্রিক বল, মানসিক পরিণতি ও হার্দিক দৃঢ়তা দরকার।" রবীন্দ্রনাথকে নিয়ে লেখা একটি প্রবন্ধের শেষে অমর্ত্য সেন বলছেন "It is in the sovereignty of reasoning -- fearless reasoning in freedom -- that we can find Rabindranath Tagore's lasting voice", লক্ষণীয় fearless শব্দটি।

সত্যের দাবী, সুযুক্তির দাবী যে সহজ নয়, সেটা বুঝতে অসুবিধা হয় না, কিন্তু তাতে তো তার প্রাসঙ্গিকতা কমে না। আজকের দিনে খণ্ডসত্যের মুগ্ধতায়, গোষ্ঠী আনুগত্যের নিরাপদ আশ্রয়ের পাশাপাশি একটা অভাববোধ যে তৈরি হয় সেটা আমরা সবাই অনুভব করি। আছে গবেষণার কল্পনায় সাহসের অভাব, সমকালীনতার মোহ আর পুনরাবৃত্তি। অন্যদিকে funding এর অগ্রগণ্যতায় প্রকল্পর দিক বদল। এসব অভাবের জন্যই বিংশ শতাব্দীতে এসে আবার আমরা এক বীরকে আবিষ্কার করি। তিনি গ্যালেলিও।

সত্য ও যুক্তিনিষ্ঠতার পাশে আরেকটা দাবীও খুব সম্ভব ছিল - সেটা কল্যাণের দাবী। শান্তিনিকেতনের এক গবেষক, রবীন্দ্রনাথের সঙ্গী ক্ষিতিমোহন লিখছেন "সত্য বিনা কল্যাণ নাই, আবার কল্যাণ হইতে নিবৃত্ত হইলে সত্য দিয়াই বা হইবে কী ?"

সাহসের সঙ্গে যখন সত্যের প্রসঙ্গটা এল, তখন তার-ই প্রশ্রয়ে আর একটা কথা বলে নিই। সাহসের সঙ্গে সততারও একটা সম্পর্ক আমরা মেনে নিই। যে মানুষটি চাকরির প্রয়োজনে জাল মার্কশীট জমা দেয় তাঁকে আমরা সাহসী বলি না, বলি দুঃসাহসী। বীরধর্মের সঙ্গে সততার সম্পর্ক আছে বলেই ভাড়াটে সৈনিককে আমরা বীরের আসনে বসাইনা, যেমনি বসাইনা রণবীর সেনা বা শিবসেনাকে।

আবার আমরা ফিরে যেতে পারি ১৯০১ সালে লেখা সংকল্প সঙ্গীতে -

যদি দুঃখে দহিতে হয় তবু মিথ্যা চিন্তা নয়।
যদি দৈন্য বহিতে হয় তবু মিথ্যা কর্ম নয় ।
যদি দণ্ড সহিতে হয় তবু মিথ্যা বাক্য নয়।

প্রসঙ্গত আমাদের মনে আসে আরেক সক্রিয় দার্শনিকের কথা - তিনি বার্ট্রান্ড রাসেল। ছাত্র জীবনের কেমব্রিজের কথা মনে করতে গিয়ে রাসেল ভাবেন তাঁর দীপ্ত মেধা কিছুই পায়নি সেখানকার প্রতিদিনের পাঠক্রম থেকে ; কেমব্রিজে তাহলে কি তিনি কিছুই পাননি ? অত্যন্ত শ্রদ্ধার সঙ্গে বলছেন কেমব্রিজ তাঁকে দিয়েছিল সততার দীক্ষা।

এইখানে একটু ব্যক্তিগত খটকার কথা বলে নিই - মিথ্যা চিন্তা নয়, মিথ্যা কর্ম নয় - সততা কি এই নেতিবাচক রূপেই ব্যক্ত হয়, বাপুর তিন বাঁদরের শপথের মত? ধর্মভীরুও তো এইভাবে পথ ঠিক করে । Internal Assesment এর জোরে ছাত্রকে চোখ রাঙাবো না, ছাত্রের শ্রমসাধ্য গবেষণা আত্মস্যাৎ করব না - সততার কি এই রকম একটাই রূপ যে রূপটা নেতিবাচক ? না কি তার একটা ইতিবাচক রূপও থাকা সম্ভব ? কথা হচ্ছিল বীরের সাহসকে ঘিরে। এই সাহসের একটা অত্যন্ত ব্যক্তিগত দিকও থাকে, একটা কষ্ট স্বীকারের ব্যাপার থাকে। কোনো বিদ্যাঙ্গনই, সেটা যদি প্রযুক্তি তথা কারিগরী চর্চা কেন্দ্র না হয়, খুব একটা উপার্জনক্ষম হতে পারে না। ফলে তার কর্মী বা শিক্ষককে পূর্ণ প্রতিদান দিতে পারে না। সাংসারিক পরিকাঠামো হয় অপ্রতুল। আজ থেকে একশো বছর আগে যাঁরা পরিবারকে দেশের বাড়িতে রেখে, অথবা সঙ্গে নিয়ে শান্তিনিকেতন নামে এক ঊষর প্রান্তরে এসেছিলেন, একটা বড় সিদ্ধান্ত তাঁদের নিতে হয়েছিল। আসলে বীরত্বের সঙ্গে একটা নির্লিপ্ততা একটা রিক্ততার অনুসঙ্গ আমরা মেনে নিই। তাই আমাদের একজন বীর দাতা কর্ণ। 'ওয়েস্টার্ন' সিনেমার নায়ক শেষ যুদ্ধটা জিতে নেবার পর সূর্যাস্তের দ্গিন্তের দিকে হারিয়ে যায়।

বীরের একটা গুণ বলে ধরে নিই তার লক্ষমনস্কতাটিকে, টিয়া পাখির লাল ঠোঁটটার দিকে তার কেবল নজর। নিজের একটা ছবি শেষ করার কাহিনী বলতে গিয়ে বিনোদবিহারী বলছেন "আমি জানি কোনো একটা বিষয় যদি কায়মনোবাক্যে চিন্তা করা যায় তাহলে তার একটা অপ্রত্যাশিত মীমাংসা ঘটে।" (এখানেই আপনি

Scanned with CamScanner

আপত্তি তুলতে পারেন - এসবের অনেক গুণই তো আমরা কল্পনায় শিক্ষকের মধ্যে দেখি; অবশ্যই অনেকগুলি, কিন্তু সবগুলি নয়, আর তাহলে আলাদা করে বীরধর্মের কথাটা আসতো না)

এইখানে মনে পড়ে প্রভাস সেন মশাইয়ের কাছে শোনা একটি কাহিনী। সেটা সত্তরের দশকের প্রথম দিক, প্রধান মন্ত্রী ইন্দিরা গান্ধী আচার্য্য, ক্ষমতার তুঙ্গে তাঁর অবস্থান। শান্তিনিকেতনে এসেছেন। একদিন দুপুর বেলা প্রায় নিঃশব্দে এসেছেন পূর্বতন গুরুর সঙ্গে দেখা করতে। বিনোদবিহারী থাকতেন শ্রীপল্লীর সুইমিং পুলের দিকে নিরিবিলি একটা কোয়ার্টারে। দেখা অবশ্যই হল, কিন্তু বিনোদবিহারী বললেন "ইন্দু তুমি এসেছ, আমি খুব খুশি হয়েছি, কিন্তু এই দুপুরবেলাটা আমার না পড়াশোনার সময়।" ইন্দিরা তেমনি নীরবেই বিদায় নিয়েছিলেন। আজ যখন ক্ষমতার অলিন্দে বহু বিদ্দজ্জনের মুগ্ধ উঁকি ঝুঁকি, স্তাবকতা, প্রয়োজনে অর্দ্ধসত্যের পুনরাবৃত্তি, আর অন্য দিকে রাজনীতিবিদও চান বিদ্যা আর তার অঙ্গনের দখল, তখন স্বাভাবিকভাবেই এই কাহিনী আমাদের মুগ্ধ করে দিয়েছিল। আপনি বলতে পারেন ইন্দু তাঁর ছাত্রী বলেই তো একথা তিনি বলতে পেরেছেন। তা হলে তার উলটো দিকের বাজে কথাটাও বলতে হয় - পূর্বতন কোনো ভক্ত ছাত্র ক্ষমতা বা বৈভবে প্রতিষ্ঠিত হলে কিছু খুচরো সুযোগ জুগিয়ে নেবার ইচ্ছা শিক্ষকের মনে কি আসে না ?

এখানে আমরা মনে করতে পারি যে আশ্রম বিদ্যালয় প্রতিষ্ঠার পূর্বোক্ত সেই প্রথম দিনটাতেই রবীন্দ্রনাথ তাঁর বিদ্যালয়ের ছাত্রদের সম্ভাষণ করেছিলেন, বলেছিলেন "হে সৌম্য মানবকগণ - অনেক কাল পূর্বে এই দেশ এই ভারতবর্ষ সকল বিষয়ে যথার্থ বড়ো ছিল- তখন এখানকার লোকেরা বীর ছিলেন। . . . যথার্থ বড়ো কাহাকে বলে ? তাঁদের মধ্যে সবচেয়ে যাঁরা বড় ছিলেন সেই ব্রাহ্মণেরা ধনকে তুচ্ছ মনে করতেন। . . . অথচ বড় বড় রাজারা তাঁদের কাছে মাথা নত করতেন। . . . তাঁরা বড় হয়েছিলেন কী গুণে ? . . . মিথ্যার কাছে তাঁরা মাথা নত করতেন না"। (এখানেও আবার সেই বীরত্ব আর সত্যমিথ্যার অবতারণা !) এইখানে স্মরণ করতে পারি এক সময়ের খুব পরিচিত একটি কল্পবিজ্ঞান উপন্যাসের একটি ঘটনা। উপন্যাসটি বিশিষ্ট জ্যোতির্বিজ্ঞানী ফ্রেড হয়েলের "Black Cloud"।

Scanned with CamScanner

ঐ উপন্যাসে একটা কালো মেঘ পৃথিবীর দিকে এগিয়ে আসছে বহির্জগত থেকে। সেটা ক্ষতি করতে পারে। জ্যোতির্বিজ্ঞানীদের চোখে পড়েছে। বৃটেনের শাসকেরা প্রথমে অমনোযোগী। তার পর একটা সময় সংকট বুঝে বিজ্ঞানীদের আশ্রয় নিচ্ছেন। প্রধান বিজ্ঞানী তখন বলছেন এতদিন তো আপনারা দেশ চালালেন, এবার তাহলে বিজ্ঞানীদের হাতে ছেড়ে দিন। এই দাবী নিশ্চয়ই আমাদের নাড়া দেয়। দেশের ক্ষমতা যদি বিদ্দজ্জনের হাতে আসে আমরাই তো সেই ইচ্ছা পোষণ করি। একজন অর্থনীতিবিদ দেশের হাল ধরলে আমরা সেটা শ্রেয় মনে করি। কিন্তু ঐ গল্পে বিনোদবিহারী নিজের জন্য সে রকম কোন দাবী তো রাখেননি। তিনি শুধু চেয়েছিলেন তাঁর পড়াশোনার সময়টা নষ্ট না করতে দিতে। তাঁর নিজের পরিসর নিজের অবসর তাঁর নিজের কাছে মূল্যবান। এটা তিনি হারাতে রাজি নন। আমরাও তাঁকে নির্জনপ্রেমী বলেই জানি, শিবকুমার ব্যবহার করেছেন recluse শব্দটি। এখানে তিনি নিজেও অবশ্য হেঁয়ালি করেন। একজন যেমন গাইতে পারে "জীর্ণ পাতা ঝরার বেলায় গান গেয়েছিলেম, মনে রেখো", বিনোদবিহারী চিত্রকরে বলছেন "অসহযোগ আন্দোলনের সময় আমার এক বন্ধু আমায় বলেছিলেন যে দেশের এই দুর্দিনে আপনার লজ্জা করে না বসে বসে কাগজে রং লেপতে ? কিন্তু আমি নির্লজ্জের মত সারাটা জীবন কাগজের ওপর রং লেপেই কাটালাম। আসল কথা, আমার স্বভাব এমন যে কোনো সামাজিক দায়িত্বের সঙ্গে আমি নিজেকে মিলিয়ে নিতে পারিনি। পাকিস্তান-হিন্দুস্থানের ইতিহাস তৈরি হয়েছে আমার চোখের সামনে। দুর্ভিক্ষ, বন্যা, ভূমিকম্প ঘটেছে - এর সঙ্গে কোনো ঘনিষ্ঠ সম্বন্ধ আমার ছিল না। এ বিষয়ে কোনো ছবিও আমি করিনি।" এরকম নির্মেদ বক্তব্য তাঁর পক্ষেই সম্ভব। কিন্তু শুধু এই কথাগুলির মধ্যে তাঁকে পুরোটা কি পাওয়া যায় ? সে প্রসঙ্গে পরে আসার চেষ্টা করব।

*　　　　*　　　　*

আশ্রম বিদ্যালয় প্রতিষ্ঠার দিনটির প্রসঙ্গে বলেছিলাম ঐ দিন বিশ্বভারতীর বীজ রোপন করা হয়েছিল। আসলে ঐ বিদ্যালয়কে কেন্দ্র করেই তো রবীন্দ্রনাথ বিশ্বভারতীর স্বপ্ন দেখেছিলেন। বিশ্বভারতী প্রতিষ্ঠার পাঁচ বছর আগে ১৯১৬ সালে রথীন্দ্রনাথকে চিঠিতে লিখছেন - "শান্তিনিকেতন বিদ্যালয়কে বিশ্বের সঙ্গে ভারতের

Scanned with CamScanner

যোগসূত্র করে তুলতে হবে – ঐখানে সার্বজাতিক মনুষ্যত্বের চর্চার কেন্দ্র স্থাপন করতে হবে - স্বজাতির সংকীর্ণতার যুগ শেষ হয়ে আসছে।" ঐ বিদ্যালয়েরই extension বিশ্বভারতী, যদিও এইভাবে আমরা সম্ভবতঃ ভাবতে রাজি নই। তাঁর হয়তো মনে হয়েছিল বিদ্যালয়ে বিকশিত পূর্ণ মানুষেরা ধারণ করবে বিশ্বকে তাদের অন্তরে। ব্যক্তিত্ব বিকাশের একটা logical extension। স্বজাতির সংকীর্ণতা ছাপিয়ে সার্বজাতিক মনুষ্যত্বে যিনি বিশ্বাসী তাঁর পক্ষেই সম্ভব বিশ্বভারতীর প্রতিষ্ঠা। আর এই সম্ভাব্যতাকে বাস্তবে নিয়ে আসার কাজটাই হয়ত সততার সেই ইতিবাচক রূপ, যে বিষয়ে অজ্ঞতার কথা আগে বলেছি। পতিসরে কৃষি ব্যাঙ্ক স্থাপন, রাখী বন্ধন থেকে নানান তাগিদে মানুষটির সক্রিয় রূপটি আমরা দেখেছি। এখানে অপ্রাসঙ্গিক হলেও একটা কথা মনে করা দরকার – রবীন্দ্রনাথ যখন বিশ্বের কথা বলেন তার অর্থটা শুধুই আন্তর্জাতিক নয়। আন্তর্জাতিকতা সম্ভব হয় জাতিকে স্বীকৃতি দিলে। কিন্তু জাতির ঊর্ধ্বে মানুষকে দেখলে আন্তর্জাতিকতা পার হতে হয়, ধারণ করতে হয় একটা মানব বিশ্বের ধারণা। আর মানব বিশ্বের ধারণাটিকে গ্রহণ করলে বুঝতে পারি তার একটা স্থানীয় (local) রূপও তো সম্ভব।

বিশ্বভারতীর তারুণ্যের দিনে যে সব উদ্যোগ নেওয়া হয়েছিল তার তিনটির উল্লেখ এখানে করব। প্রথম হল শ্রীনিকেতন-শিক্ষাসত্রের উদ্যোগ। সেখানে বিশ্বের ঐ স্থানিক রূপটিতে পদচারণা। কর্মবীরের প্রসঙ্গে উদ্ধৃত করেছিলাম রবীন্দ্রনাথের একটি কবিতা থেকে ; শ্রীনিকেতনের কাজও তো ঐ মৃত্যুর গ্রন্থি থেকে জীবনকে ছিনিয়ে নেবার উদ্যোগ। এই ধরনের উদ্যোগই প্রতিফলিত হয় অমর্ত্য সেন অনেক দিন পরে যখন বলেন programme for the development of positive freedom এর কথা। এ উদ্যোগ সহজ ছিল না একাধিক কারণে। তার একটা কারণ পল্লীউন্নয়ন নাম হলেও সে কাজের অনেকটাই ছিল শ্রেণীচিহ্নিত। লক্ষ্য হিসেবে যখন বলা হয় অন্ন, স্বাস্থ্য আর শিক্ষার কথা তখন তার শ্রেণী নির্দেশটি চিনে নিতে ভুল হয় না। রবীন্দ্রনাথ যে রায়পুরের সিংহ পরিবার বা হেতমপুরের রাজপরিবারের জীবনযাত্রার মান নিয়ে উদ্বিগ্ন এরকম ভেবে নেবার কোনো কারণ দেখি না। তাই ধরে নিতে পারি এই উদ্যোগের একটা চ্যালেঞ্জ ছিল। অনেক দিন বাদে হোসেঙ্গাবাদকে ভিত্তি করে একলব্য যে বিজ্ঞান শিক্ষার উদ্যোগ নিয়ে ছিলো,

Scanned with CamScanner

তার অনেকটাই গুটিয়ে ফেলতে হয়েছে সামন্ততন্ত্রের দাপটে, এই পরাজয় কিন্তু এই নতুন শতাব্দীর ঘটনা। তেমনি পরাজিত মধ্যপ্রদেশে দিগ্বিজয় সিং এর উদ্যোগ। বাস্তবানুগ সাংবাদিক রজত রায় তার একটা কারণ হিসেবে চিহ্নিত করেছেন ঐ সামন্ততন্ত্রকেই।

দ্বিতীয় উদ্যোগ বিদ্যা ভবনকে ভিত্তি করে। এই উদ্যোগের চারণ ভারত ভূমিতে। এখানে উল্লেখ করব ব্রাত্য জনের ধর্ম সাধনার অনুসন্ধান। মন্ত্রহীন গোঁড়ামিমুক্ত যে ভাবনা রামানন্দ, কবীর থেকে শুরু করে পরবর্তীকালে বাউল আর ফকিরদের সচেষ্টায় প্রবাহিত তার একটা পথিকৃৎ গবেষণা হয় এখানে। সে কাজ ছিল খুবই শ্রমসাধ্য (বিদগ্ধজনের মতে এইভাবে এখানেই আসলে হয়েছে Subaltern Study-র প্রতিষ্ঠা)। গত দেড় দশক জুড়ে ভারতের একাধিক দাঙ্গার পাশবিকতায় বিমূঢ় সমাজের কাছে সে গবেষণার মূল্য ক্রমে উপলব্ধেয়। আজ থেকে সত্তর বছর আগে শান্তিনিকেতনে চর্চিত হয়েছিল বাউল মদনের গান —

তোমার যাবার পথ ঢাইক্যাছে মন্দিরে মসজিদে,
তোমার ডাক শুনি সাঁই চলতে না পাই
রুইখ্যা দাঁড়ায় গুরুতে মোরসেদে।

রবীন্দ্রনাথ অক্সফোর্ডেও যখন ভাষণ দিলেন Religion of Man, ব্যবহার করলেন এই গানেরই নিজের করা ইংরেজি অনুবাদ যেমন ব্যবহার করলেন কবীরের দোঁহার অনুবাদ। মন্দির মসজিদ আর গুরু মোরসেদের হাত থেকে দেশ উদ্ধারের এখনও অনেক বাকি। প্রথম প্রধানমন্ত্রী নেহেরুর একটা প্রচেষ্টা ব্যর্থ হয়েছে।

তৃতীয় উদ্যোগটির নাম কলাভবন। কলাভবনেই বিশ্ব শব্দটি তার বিচিত্র অভিধা নিয়ে প্রকাশ পেয়েছিল। তার এক দিক হল ব্যক্তির বিশ্ব আর মানব বিশ্বের মধ্যে, নীড় আর আকাশের মধ্যে যোগস্থাপনের সেটাই উদ্যোগ। আর তার অন্যতম পথিকৃৎ বিনোদবিহারী স্বয়ং। তিনিই বলতে পারেন "Byzantine, জৈন, পটপাটা, এসব historian এর কাছে অনেক তফাৎ থাকতে পারে, কিন্তু তোমার আমার কাছে আর্টিস্টের কাছে কী তফাৎ ?" স্পষ্ট তাঁর স্বাধিকার বোধ। আমাদের কানে বাজে তাঁর সেই পেজোমির কথা "একটা জৈনর পাশে একটা folk figure দিলে

কার বাবার সাধ্যি তাকে ধরে।" নেপালে যখন কাজ নিয়ে গিয়েছিলেন আলাপ হয়েছিল এক ব্যতিক্রমী কারিগরের সঙ্গে, তাঁর নাম কুলসুন্দর শিলাকর্মী। কুলসুন্দর প্রসঙ্গে বলেছেন "নেপালের তৎকালীন শ্রেষ্ঠ কারিগর - মধ্যযুগীয় কারিগর সম্বন্ধে আমার ধারণা তিনি সম্পূর্ণ বদলে দিতে পেরেছিলেন। কুলসুন্দর পরম্পরাগত কারিগর হলেও শাস্ত্রবাক্য লঙ্ঘন করার সাহস তাঁর ছিল।"

জাতীয়তাবাদ নিয়ে রবীন্দ্রনাথের অবস্থান আমরা জানি, বিশ্বভারতীর জন্মের আগেই উদ্বিগ্ন ছিলেন 'স্বজাতির সংকীর্ণতায়', সেই সূত্রে দুটো সদৃশ ভাবনার এখানে উল্লেখ করা যায়। ১৯৩৭ সালে জাপান থেকে রাসবিহারী বসু রবীন্দ্রনাথের সঙ্গে যোগাযোগ করেন জাপানের সহায়তায় দেশকে মুক্ত করার উদ্যোগটির সমর্থন পাবার জন্য। ইতিমধ্যে জাপান চীন আক্রমণ করেছে, জাপানে জাতীয়তাবাদের বন্যা বইছে। রবীন্দ্রনাথ চীন আক্রমণে ক্ষুব্ধ, উত্তর দিচ্ছেন "For I, along with the rest of Asia, did once admire and look up to Japan and did once fondly hope that in Japan Asia had at last discovered its challenge to the West, that Japan's new strength would be consecrated in safeguarding the culture of the East against alien interests. But Japan has not taken long to betray that rising hope and repudiate all that seemed significant in her wonderful, and, to us symbolic, awakening, and has now become itself a worse menace to the defenceless peoples of the East". তারই একবছর পর জাপান যাচ্ছেন বিনোদবিহারী, তাঁর প্রথম আশ্রয় রাসবিহারী বসু। 'চিত্রকরে' লিখছেন "দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের প্রাক্কালে চীনাবিদ্বেষ জাপানের পণ্ডিত সমাজকে কতটা প্রভাবান্বিত করেছিল" তার ইঙ্গিত তিনি পেয়েছেন। টাইকানের বক্তব্যও ছিল চীন বিদ্বেষী, "কারণ জাপান সরকার তখন টাইকানের পৃষ্ঠপোষক"। অন্যদিকে আলাপ হল বিখ্যাত শিল্পী টাকেউচি সেইহোর সঙ্গে। শিল্পীর বয়স সত্তরের উপর। "বহুক্ষণ কথাবার্তার মধ্যে কোথাও চীন পরম্পরার বিরুদ্ধে তাঁর কোনো ঝাঁঝ লক্ষ করিনি। বরং তিনি বললেন, 'চীনদেশের কাছ থেকে আমরা অনেক পেয়েছি। পলিটিক্সের সঙ্গে আর্টিস্টের সম্পর্ক কী ?'"

Scanned with CamScanner

কলাভবনের উদ্যোগের অন্য দিকটি হোল দেবলোক থেকে মানব লোকে শ্যামল মাটির ধরাতলে শিল্পীর যাত্রা। (আর সেটা খেয়াল করে আমাদের কাছে প্রথম যিনি বললেন তিনি বিনোদবিহারী।) ক্রমে জায়গা নিচ্ছিল মানব বিশ্বের স্থানীয় রূপ, তার চারপাশ, তার চাষবাস, গরু শুয়োর নেড়িকুকুর আর অবশ্যই তার রুক্ষ খোয়াই। ধরে নিতে পারি দ্বন্দ্ব আর বিনিময়ের মধ্যে দিয়েই সেটা সম্ভব হয়েছে। রবীন্দ্রনাথের উপস্থিতির নিশ্চয়ই একটা ভূমিকা তাতে ছিল। তাহলে বুঝতে হয় যে তাঁকেও একটা ভাবনা ভাবতে হয়েছিল, বিনিময় করতে হয়েছিল।

তারপর হিন্দী ভবনের দেওয়ালে যখন ছবি আঁকলেন, তখন বেছে নিলেন পূর্বোক্ত সাধক, কবীর, দাদু, রুইদাসদের জীবন, আর তাঁদের ঘিরে মানবজীবন। সেই জীবনের ছবির সঙ্গে মিলে যায় কত্তামশাইয়ের অভিজ্ঞতা - কত্তামশাই দেখছেন আদি অন্তহীন প্রবাহ। প্রবাহের কূলে কূলে গ্রাম নগর, বন উপবন —নরনারী সংসার করছে। আজ হিন্দী বলয় বলতে মনে আসে যে জাতপাত ব্রাহ্মণ্যবাদ আর ভেদাভেদের দমবন্ধকরা দাপট, হিন্দীভবনে তারই বৈসাদৃশ্যে বৈপরীত্যে রয়ে গেল তাঁর এই কাজ। (খেয়াল করি, চীন ভবনের দোতলায় হাল্কা চালে শান্তিনিকেতনের শিক্ষা জীবনের যে ছবি এঁকেছেন তারও এক কোণে রেখেছেন একটি বাউল গান

"গুরু বলে কারে প্রণাম করবি মন
তোর অথিক গুরু, পথিক গুরু- গুরু অগনন")

তারও তিরিশ বছর পর কলাভবনের নতুন হলঘরের দেওয়ালে আবার সাজালেন জনজীবনের ছবি। বললেন তারা আসবে যাবে দেখবে বুঝতে পারবে এটা তাদেরই ছবি। এখানে পেলাম একটা একাত্মতার কথা। নিজেরও একটা আত্মপরিচয় তিনি ধরে রেখেছিলেন। 'আমি সাধারণের একজন একথা আমি কখনো ভুলিনি।' যে মানুষটি মধ্যাহ্নের আলাপচারিতার জন্য নিজের অবসরটি হারাতে রাজি নন তিনিই বলছেন এই কথা। যিনি বলেছিলেন পাকিস্তান হিন্দুস্থান তৈরি — দুর্ভিক্ষ, বন্যা ভূমিকম্পর সঙ্গে কোন সম্বন্ধ তাঁর ছিল না তিনিই বলছেন এই কথা। আসলে তিনি নিজেও জানেন তাঁর নোঙর কোথায় বাঁধা। হিন্দী ভবনের কাজে যে inalienable parts of a life force দেখেছিলেন গীতা কাপুর তার উৎস হয়তো এখানেই। বিনোদবিহারী আরো বলছেন 'আধুনিক বৈজ্ঞানিক সভ্যতা যখন প্রায় কঠিনতার

Scanned with CamScanner

চরম সীমায় এসে পৌছেছে সেই সময় অতি পুরাতন একটি সত্যের জন্য মানুষের আকাঙক্ষা জন্মেছে - মানুষ আবার চাইছে মানুষের অধিকার। 'মানুষের অধিকার' এই অমূল্য শব্দটি বারে বারে উচ্চারিত হয়েছে — আজও শিল্পীদের দায়িত্ব হল এই মহৎ বাণীকে নিজের জীবনে উপলব্ধি করা এবং প্রকাশ করা।' এই ভাবে জ্ঞান চর্চার মত শিল্প চর্চা যুক্ত হচ্ছে কল্যাণের সঙ্গে বলা উচিৎ শুভর সঙ্গে। আর এই ভাবেই তিনি ভাঙছেন সেই হেঁয়ালিটা। অধিকৃত অবসরে শিল্পী তাঁর নিজের জীবনে উপলব্ধি করবেন ঐ মহৎ বাণীকে। আর সেইখান থেকেই উৎসারিত তাঁর প্রিয় নির্জনতার দাবীটি। সেই নির্জনতাতেই তিনি ছোঁবেন, ছুঁয়ে থাকবেন মানবজীবন। তিনি যে এতো নির্জন নিসর্গ এঁকেছেন সেখানেও কি চিহ্ন রেখে গেছে এই মানবাধিকারের প্রশ্নটি ? আধুনিক বৈজ্ঞানিক সভ্যতা যখন প্রায় কঠিনতার চরম সীমার বিপরীতে কী দেখতে চান তিনি ? সে কি বৃক্ষপ্রেমিকের জন্য প্রকৃতির কোন পরিসর ? তারপর তিনি আরো বলছেন, 'কিন্তু অবসর নির্জনতা একা থাকবার শক্তি আমরা প্রায় ভুলতে বসেছি। তাই নির্জনতাকে আমরা যতদূর সম্ভব দূরে ঠেলে রাখতে চাই। দৈনিক পত্র, রেডিও, টেলিভিশনের সাহায্যে, নানা মতের দ্বারা নিজেদের মনুষ্যত্বকে আবৃত করে রাখি।' একটা কথা সম্ভবত সত্য – সেটা হল মতবাদ নিয়ে তাঁর একটা এলার্জি ছিল – আনুগত্য জিনিসটা তাঁর কাছে একটা সমস্যা। কিন্তু শুধু তো সেটা নয়, আরো প্রশ্ন আছে। কারণ এইখানে একটা কথা খানিক নতুন মনে হয় - আমরা ভেবে অভ্যস্ত মতের চাপে বাধা পায় ব্যক্তিত্বের বিকাশ, কিন্তু ব্যক্তিত্ব নয়, তার জায়গায় তিনি বলছেন মনুষ্যত্বের সংকটের কথা। তাঁর কাছে নির্জনতার প্রয়োজন ঐ মনুষ্যত্বের প্রকাশ প্রয়োজনে।

তিনি কি বিশ্বাস করেন সকলের মনের গভীরে থাকে এমন একটা মনুষ্যত্ব যেটাকে আড়াল করে দেয় মতের পরে মতের আস্তরণ ? সারাটা জীবন রং লেপে কাটানো কি তবে সেই আস্তরন ঘোচাবারই ব্রত ? আর তার সঙ্গে তিনি কি ভেবে নেন মানুষের গভীরে থাকে একটা অন্তর্জাত নৈতিকতার সম্ভাবনা ? সেটাকে মুক্তি দেবার দায় আর তারই দায়ে প্রয়োজন এক নির্জনতার ? কোনো অপরাধবোধ তাড়িত নৈতিকতা নয়, এই হৃদয়ের উৎসমুখের কোনো এক স্বচ্ছতোয়াই কি পুষ্ট করবে শিল্পীর কর্তব্য করণীয়র ভাবনাগুলিকে ? কিন্তু সে কাজ সহজ নয় - তার

একটা কারণ একা থাকবার শক্তি আমরা ভুলতে বসেছি।

*　　　　　　　　*　　　　　　　　*

আমাদের বীরদের একজন কর্ণ, তাকে কুড়ে কুড়ে খেয়েছিল অপমানিত পরিত্যক্ত অবস্থান। সে নিজেই ঠিক করে নিয়েছিল - 'আমি রব নিস্ফল হতাশের দলে'। এ রকম একটা ক্ষোভকেই লালন করেছিলেন বিনোদবিহারী। এই ক্ষোভ যথার্থ কিনা সে মন্তব্যের কোন ক্ষমতাই এই লেখকের নেই। রবীন্দ্রনাথের মৃত্যুর পর শান্তিনিকেতন আর কলাভবনের দোলাচলে তিনি নিঃসঙ্গ বোধ করেন.। দৃষ্টিশক্তি সম্পূর্ণ চলে গেলে এই চিন্তা হয়তো তাঁকে আরো গ্রাস করেছিল। শেষের দিকে তাঁর কাছে পড়তে আসা একাধিক ছাত্র বিভ্রান্ত হয়েছে তাঁর আকস্মিক কর্কশ ব্যবহারে। কিন্তু এসব ছাপিয়ে যায় মানুষটির অন্ধত্ব অতিক্রমী জেদ ও মনন।

যে মানুষটি চোখে একটা ব্যর্থ অস্ত্রোপচারের পর হাসপাতাল থেকে বেরোবার সময় বুঝতে পারে রোদের তাপ, কিন্তু দেখতে পায়না তার আলো সেই নিদারুন বিপর্যয়ের পর আবার সে ফিরে আসে শান্তিনিকেতনে, আবার তার নির্জনবাসে, "হাতলওয়ালা কুর্সিখানার" ওপর। "আলোর জগৎ থেকে অন্ধকার জগতে প্রবেশ করে আমার শিল্পীজীবনের নতুন অধ্যায় শুরু হল।" একটা অসাধারণ under-statement। তার কাহিনী সবার জানা, তার প্রক্রিয়াটাও অনুমানসম্ভব। নিয়তিকে কত্তামশাই বলে "মানুষ যে তোমার প্রতিদ্বন্দ্বী। তাই তো তোমাকে উপেক্ষা করছে মানুষ।" আর এইভাবেই আশ্চর্যের মত প্রতিকূলতাই রূপান্তরিত হয় নতুন অস্তিত্বে। আর এইভাবেই তিনি জিতে যান। এই শিল্পী যখন একটা ফেল্ট্ পেন সম্বল করে ক্যালিগ্রাফি রচনা করেন –

"জয় পূর্ণ জাগ্রত জ্যোতি তব,
জয় তিমির নিবিড় নিশিথিনী ভয়দায়িনী"

তখন আবার আমাদের মনে পড়ে বিদায় বেলায় সুদর্শনার উক্তি "যাবার আগে আমার অন্ধকারের প্রভুকে, আমার নিষ্ঠুরকে আমার ভয়ানককে প্রণাম করে নিই।" বুঝতে পারি "আজ আমি আলোর জগতে অন্ধকারের প্রতিনিধি" বিনোদবিহারীর এই কথা শুধু ক্ষোভ নয়, তার একটা গরিমাময় দর্প আছে। এখানেই, এভাবেই কি তাঁর ঐ একা থাকার শক্তির পরীক্ষা ?

Scanned with CamScanner

আমাদের মনে পড়তে পারে বিশ্বভারতীর সমাবর্তন উৎসব যখন শেষ হয়ে আসে, দীক্ষার শেষে ছাত্রদের আশীর্বাদ জানানো হয় "আত্মদীপ ভব" (এটাও তো আরেকটা ফিরে যাওয়া দুহাজার বছর আগে বুদ্ধের কাছে ; আমাদের আরো মনে পড়ে চীনভবন দোতলায় সাজানো ঐ বাউল গানটি)। বিনোদবিহারীও তো বলেছিলেন একটি দীপ শিখার কথা। রুদ্রনারায়ণ যখন জাদুর ঘূর্ণাবর্তে ছিটকে পড়েন অন্ধকারে, পথ কোথায় ঠাঁই কোথায় তিনি জানেন না তখন "গুহাভ্যন্তরস্থিত দীপশিখার মত তিনি স্থির।" তারপর অজানা ঝঞ্ঝা দোলায় মনে হয় "গৃহাভ্যন্তরস্থিত দীপশিখা দুলে দুলে উঠছে, সত্যের দীপশিখা বুঝি বা নিভে যায়।" (আবার সেই সত্যের অবতারণা ! মতের আড়ালে ঢেকে যাওয়া মনুষ্যত্বের কথা যখন বলেছিলেন তখনও কি তাঁর মনে হয়েছিল ঐ গুহাভ্যন্তরস্থিত দীপশিখার কথা ?) ক্রমে "তিনি শুনতে পাচ্ছেন অন্ধকারে আকারের ঝংকার। . . . নিরেট অন্ধকারের মধ্যে গভীরতার সাক্ষাৎ পেলেন কত্তামশাই।" তখন কে একজন সাবধান করে "কত্তামশাই হাতে যা পেলে তাতো পেলে, এখন একবার ভেবে দেখ তোমার উপলব্ধি আসল না নকল।" কত্তামশাই ঠিক করলেন সত্যমিথ্যা যাচাই করে নেবেন ভাবনার পথে। নিয়তি আর সত্যের যাচাইয়ের এই আকাঙ্ক্ষার উপরেই তো মানুষের autonomyর, তার স্বাতন্ত্র্যের প্রতিষ্ঠা। বাইরের পথ যখন রুদ্ধ হয়ে যায়, বর্ষার দিনে বাইরে খবরের কাগজ ছুঁড়ে দিয়েও বৃষ্টি থামল কিনা সেই বিভ্রান্তিটা না কমে যায় বেড়ে, তখন এই একটা পথই তো শুধু খোলা থাকে, কিন্তু সেটাকে গ্রহণ করা আর ধারণ করার সাহস যে সহজ নয় অনুভব করা যায় - আয়ুব যেমন বলেছিলেন সত্যের মুখোমুখি দাঁড়াবার মত চারিত্রিক বল, মানসিক পরিণতি ও হার্দিক দৃঢ়তা দরকার। আর সেইখানেই কত্তামশাই আর বিনোদবিহারীর বীর্য প্রতিষ্ঠিত, স্পন্দমান দেদীপ্যমান। কত্তামশাই বলেছিলেন "আমার জগতে যে আলো আছে, সেই আলোতে এই সব আমি করতে পারি। . . . মহাপুরুষ আমি একেবারেই নই। খুব সামান্য আমার আলো।" সে আলো সামান্য না অসামান্য বুঝতে পারি না তবে এই মানুষটির কাছে একবার ফিরে যাবার টান অনুভব করি।

চর্যা ও চর্চা
তড়িৎ রায় চৌধুরী

"আমার জীবনদেবতা যে একটি অন্তরতম অভিপ্রায়কে বিকাশের দিকে লইয়া চলিয়াছেন তাহাকে উদ্‌ঘাটিত করিয়া দেখাইবার শক্তি আমার নাই।"

স্মৃতিপটে ভেসে আসা হাল্কা ছবি যখন ভাঙা-গড়া, ঘাত-প্রতিঘাত, সংঘাত-সম্মিলনে গাঢ় ভাস্কর্যের ঘনতা পেয়েছে তখন সেই খাস মহলের দরজায় এসে পথ ফুরিয়েছে 'জীবনস্মৃতি'র। শেষ পরিচ্ছেদ 'কড়ি ও কোমল'। কাব্যপ্রবাহে এরপরেই 'আর্টিস্টের হাতে রচিত ঈশ্বরের প্রথম অসম্পূর্ণ প্রতিমা' – মানসী। এইখানে এসেই কবির সাথে যোগ দিলেন এক শিল্পী। আর্টিস্টের সেই ছোঁয়াকে, প্রতিমার সেই হয়ে ওঠাকে, কেমন ভাবে প্রকাশ করবেন গদ্যকার !

বস্তুত বহিবিশ্বের মতোই নিজস্ব সৃষ্টির জগতও অমোঘ আগ্রহের কেন্দ্র হয়েও ব্যাখ্যাতীত রয়ে গেছে দীর্ঘকাল। স্রষ্টা তো প্রজাপতি ব্রহ্মাস্বরূপ; আত্মসৃষ্টিরহস্য বিশ্বসৃষ্টিরহস্যেই প্রতিচ্ছায়া। এই রহস্যের স্বরূপ উদ্‌ঘাটনেই জন্ম নিয়েছে কাব্যতত্ত্ব, শিল্প-জিজ্ঞাসা। ঈশ্বরের অনুসন্ধানের মতোই গুরুত্বপূর্ণ হয়ে উঠেছে আত্মানুসন্ধান। আর সেই সন্ধানের এক প্রলম্বিত বাহুমুদ্রায় দেখা দিয়েছে আত্মজীবনী। 'কাব্যরচনা ও জীবনরচনা ও দুটা একই বৃহৎ রচনার অঙ্গ।'

"ঠাঁই নাই ঠাঁই নাই ছোট সে তরী
আমারই সোনার ধানে গিয়াছে ভরি।"

সৃষ্টিই স্রষ্টার মুখ্য পরিচয়। তবু কবিসত্তার পাশে জীবসত্তার দাবীও কম নয়। হয়তো সেই দাবীতেই আদি-মধ্যযুগের কবিরা ব্যবহার করতেন 'ভনিতা'। মঙ্গলকাব্যধারায় গ্রন্থপরিচয়ের অজুহাতে যা হয়েছে আরো বিস্তৃত।

অবশ্য ইউরোপীয় রেনেসাঁসের প্রভাবে ঊনবিংশ শতাব্দীর আবহ ছিল অন্যরকম। নবজাগরণের কেন্দ্রে ছিল মানুষ। ইহলৌকিক আগ্রহের অংশরূপেই পড়ুয়া সাধারণের মধ্যে উপন্যাসের কল্পচরিত্রের পাশাপাশি গুরুত্ব পেল বাস্তব জীবনের ছবি। জীবনী সাহিত্যের সঙ্গে এল আত্মজীবনী রচনার প্রাবল্য। একদিকে দেওয়ান কার্ত্তিকেয় চন্দ্র

Scanned with CamScanner

রায় থেকে পণ্ডিত শিবনাথ শাস্ত্রী যেমন লিখলেন 'আত্মচরিত' তেমনি ঘরোয়া রাসসুন্দরী দেবী থেকে কবি নবীনচন্দ্র রচনা করলেন 'আমার জীবন'। অষ্টাদশ শতাব্দীর ইংরাজী সাহিত্যের মতোই আত্মভাবনার আয়োজনে ভরে উঠল বাংলা সাহিত্য। স্বয়ং বঙ্কিমচন্দ্রেরও মনে হল 'কবিত্ব অপেক্ষা কবিকে বুঝিতে পারিলে আরও গুরুতর লাভ।' এ যেন স্বয়ং ঈশ্বরকে পেয়ে গেলে বিশ্বপ্রকৃতির কিছুই আর অজ্ঞাত থাকে না। অথচ রবীন্দ্রনাথ তখনও মন করেন 'কবিরে পাবে না তার জীবনচরিতে।' অবশ্য জীবনের রহস্যময় প্রকাশকে নষ্ট করে ডায়রির logical sequence - এই সিদ্ধান্তকে সামনে রেখেই একদিন রচিত হয়েছিল পঞ্চভূতের দিনলিপি। আসলে জীবনের স্তূপাকার তথ্যের শ্রীহীন প্রকাশেরই বিরোধী রবীন্দ্রনাথ। ইউরোপকে 'চরিত বায়ুগ্রস্ত' বলে রচনা করেন 'চারিত্রপূজা' — চরিত নয় তাঁর লক্ষ্য চারিত্র; তিনি চান ব্যক্তিত্বের উন্মোচন। বলাবাহুল্য এই ভাবনার বীজ উপ্ত ছিল পিতৃদেবের 'আত্মজীবনী'র মধ্যে।

কালনুক্রমে বিনোদবিহারীর আত্মজীবনী ত্রিপর্বীয় –

কত্তামশাই (শারদীয় এক্ষণ ১৩৭৯)
কীর্তিকর (জয়শ্রী, বৈশাখ ১৩৮১)
চিত্রকর (শারদীয় এক্ষণ ১৩৮৪)

'চিত্রকর' গ্রন্থে সজ্জাবিন্যাসটি জীবনের ধারাক্রমে - চিত্রকর, কত্তামশাই, কীর্তিকর। ছোট থেকে অন্ধত্ব পর্যন্ত চিত্রকর পর্ব ; পরবর্তী পর্বে বর্ণহীন জগতের কথকতা। যাপনছন্দের বিপ্রতীপ এই প্রকাশকালের কোন নির্দিষ্ট সদুত্তর আছে বলে মনে হয় না। হয়তো আত্মপ্রতিবিম্ব উপস্থাপনের এও এক কৌশল – পার্শ্বপরিবর্তন প্রতিবিম্বের ধর্ম।

বলাবাহুল্য বাংলাসাহিত্যে 'জীবনস্মৃতি' পরবর্তী সচেতন আত্মজীবনী আর সরল স্মৃতিকথা থাকে নি হয়ে উঠেছে জটিল আত্মচর্চা। কর্মজীবনের প্রথম পর্বে গ্রন্থাগারিক বিনোদবিহারী নিজেই একটু একটু করে হয়ে উঠেছেন গ্রন্থাগার। চর্চা তার যাপনেরই অঙ্গ। দৃষ্টির দুর্বলতা জীবনের প্রথম থেকেই তাঁকে যথেষ্ট আত্মসচেতন করেছিল — চিত্রকর -এর নিবিড় পাঠ তার সাক্ষ্য দেয়। পাশাপাশি এই প্রতিবন্ধকতা

Scanned with CamScanner

জয় করে চিত্রশিল্পী হবার আকাঙ্ক্ষা তৈরি করেছে এক দুর্মর সত্তাকে। পূর্ণ অন্ধত্বের প্রথম পর্বে কিছুটা হতোদ্যমই হয়ে পড়েছিলেন কত্তামশাই ওরফে বিনোদবিহারী। ফসিল হবার সাধনাও শুরু করেন; শ্রুতিলিপির লেখিকা যাকে বলেন নির্মম হবার সাধনা। শিল্পীর কাছে দৃষ্টিহীনতার এই হতাশা স্বাভাবিক । কিন্তু সৃজনশীল সত্তাই পারে — ধ্বংসস্তূপে এল নতুন আলো — একদিন বুঝতে পারলেন আলোছায়ার জলতরঙ্গ হারিয়ে ফেলেছেন সত্য কিন্তু আজ তিনি শুনতে পাচ্ছেন অন্ধকারের ঝংকার। এতদিন তিনি দেখেছেন ঘরখানা লম্বা, এখন জানছেন ঘরখানা চৌকা। পুরনো ঘরখানা নতুন হয়ে গেল।

নিরেট অন্ধকারের মধ্যে গভীরতার যে সাক্ষাৎ পেলেন তা সুন্দর না হোক প্রাণস্পন্দনের মতো তাঁর কাছে সত্য। এ যেন 'সাহিত্য' থেকে 'সাহিত্যের পথে' বেরিয়ে পড়েছেন কবি। এতদিন জেনেছেন যা সুন্দর তাই সত্য আজ মনে হল যা সত্য তাই সুন্দর। এতদিন তিনি পুতুল গড়েছেন নিজের ব্যক্তিত্বের ছাপ ফেলে। আজ একই মোমের তালে প্রকাশ পাচ্ছে তাঁর অস্তিত্ব। তিনি প্রত্যক্ষ করছেন কালপ্রবাহ। তিনি জানেন পুতুল মোমেরই হোক আর লোহারই হোক, তার লয় অনিবার্য। কিন্তু এই যে আনন্দ, এই যে উপলব্ধি — নিত্যদিনের এই সৃজনের আনন্দ অস্বীকার করে শাশ্বত সৃষ্টি বা অমর কীর্তির বাঁধা পথকে। কাক জোৎস্নায় এসে পড়ে অমাবস্যার ছায়া।

আত্মপ্রকাশের প্রবণতা মানুষের মৌলিক প্রবৃত্তিগুলির অন্যতম। ছোটবেলায় কিছুদিন ঠোঙা বানিয়েছিলেন বিনোদবিহারী। তারপর "বাড়ির জিনিসপত্র এলেই ছুটে দেখতে যাই যে ঠোঙা আমার হাতের তৈরী কিনা। প্রথম যখন আমার ছবি একজিবিশনে টাঙানো হয়েছিল তখনো আমি একইরকম উৎসাহ নিয়ে দেখতে গিয়েছিলাম।" ঠোঙা হোক বা ছবি, সৃজন প্রক্রিয়াটিই মুখ্য। আত্মপ্রকাশ আসলে আত্মসৃজনেরই নামান্তর। মোম ফুরিয়ে গেছে। হাতের কাছে একটা কাগজ অকস্মাৎ অসামান্য আকার নিয়ে উপস্থিত হল। একদিন পুতুল করতে যে আনন্দ পেয়েছিলেন তারই মতো আনন্দ আজও পাচ্ছেন — কিন্তু দুই এক হয়েও এক নয়। বিচিত্রপথে প্রবাহিত জীবনের গতি।

Scanned with CamScanner

মনুষ্যত্বের পূর্ণ বিকাশই শিক্ষার লক্ষ্য। বৈচিত্র্যময় মানবজীবনের গতিপ্রবাহ বজায় রাখতেই প্রয়োজন চর্চা। সমাজ চিরকাল স্থিরতায় আস্থাশীল। বিচিত্র গতিপ্রবাহে বাধা হয়ে দাঁড়ায় সংঘবদ্ধ স্থিতিশীল সমাজ। অভ্যাসের জড়তাকে অতিক্রম করতে প্রয়োজন নূতন শিক্ষা, নূতন অভ্যাস, ক্রমাগত নবীকরণের চর্চা। আজকের প্রতিষ্ঠানবিরোধী কালকে নিজেই হয়ে দাঁড়ায় সবচেয়ে অনড় প্রতিষ্ঠান। তখন ভেঙে ফেলতে হয় নিজেকেই। ছন্দশেখা আর ছন্দভাঙার এই ঘূর্ণাবর্ত চলতেই থাকে। নিজস্ব মতাদর্শে বিনোদবিহারী তাই বারংবার বলতে থাকেন অভ্যাসগত শিক্ষার কথা। 'শিখিয়ে পড়িয়ে শিল্পী তৈরী হয় না' — অবনীন্দ্রনাথের এই উক্তির পরেও বলেন শিল্প শিক্ষার প্রয়োজনীয়তার কথা। অবশ্যই সে শিক্ষা নাম মুখস্থ করে কালারিস্ট হওয়া নয়; বরং রং-এর পর্দার পার্থক্য অনুধাবন করার চর্চা। কেননা "আদর্শ শিক্ষা হবে তখনই, যখন শিক্ষক ছোট বয়সের বিস্ময়কে বিদ্যাদানের মধ্য দিয়েও বাঁচিয়ে রাখতে পারবেন।"

চর্চার আগ্রহ হ্রাস পেলেই শুরু হয় অন্ধ-অনুসরণ। 'অবনীন্দ্রনাথ যা করেছেন তারপর নতুন করে পরীক্ষা-নিরীক্ষার আর কোনো প্রয়োজন নেই।' বাগেশ্বরী শিল্প প্রবন্ধাবলীর প্রায় বিপরীত এই রক্ষণশীলতাকে সনাক্ত করেন বিনোদবিহারী। কেননা তিনি জানেন — ভাবের জগতে প্রবেশ করতে পারলেই সব সমস্যা মিটে যায় না। কারণ ভাব ভাষার আশ্রয় ছাড়া প্রকাশিত হতে পারে না। অন্যের মনের ভাব ভাষার সঙ্গে অচ্ছেদ্যভাবে মিললে তবে সেই ভাব আমাদের অন্তরে প্রবেশ করতে পারে। ভাবের জগতে প্রবেশ করাও যেমন কঠিন, ভাবের সঙ্গে ভাষাকে যুক্ত করবার কৌশল খুঁজে পাওয়াও তেমনি কঠিন। রস সৃষ্টির পথে একমাত্র শিক্ষণীয় বস্তু ভাষা এবং ভাষা ব্যবহার প্রণালী।

এই ভাষাশিক্ষাকে শিল্পের ক্ষেত্রে সাহিত্যের চেয়েও বেশী গুরুত্বপূর্ণ মনে করেন তিনি — কেননা উপকরণের প্রভাব সেখানে কিছু বেশী। তাই তুলি-বাটলি থেকে ক্যামেরা-কম্পিউটার — সরল থেকে জটিল, কারিগর হিসাবে সকল যন্ত্রেরই সম্ভাবনা ও সীমাবদ্ধতা সম্পর্কে সচেতন হতে চান তিনি। যদিও মুদ্রণযন্ত্রের বিবর্তন সাহিত্যের ক্ষেত্রেও গুরুত্বপূর্ণ হয়ে উঠেছে। কেননা লিপিবিন্যাসের মধ্যেও একটা চাক্ষুস আবেদন থাকে — ছন্দ ছাড়াও ভেঙে যায় কবিতার লাইন, গদ্যের পরিচ্ছেদ।

Scanned with CamScanner

আসলে প্রকাশ, যে কোন ভাষা মাধ্যমে প্রকাশই শেষ পর্যন্ত সামাজিক প্রকাশ, কেননা ভাষা সমাজের সৃষ্টি। অর্থাৎ সামাজিক প্রকাশ যিনি করেন তিনি যেমন সামাজিক গণ্ডীতে আবদ্ধ তেমনি রসিক বা রস উপভোক্তাও সামাজিকতায় বন্দী। অনুভবন – প্রকাশন – সঞ্চরণ ; সৃষ্টি প্রক্রিয়াই সামাজিক বিধি-নিষেধ এর নিয়ন্ত্রণে বাঁধা পড়ে। অথচ নবীন প্রাণের অনুভবন সর্বদাই অনন্য — তাকে প্রকাশ করতে হয় পুরাতনের পোশাকে। তাই বলা, না বলা, অ-বলা, আর অতি-বলা-র মধ্য দিয়ে ভাষাকে চিরনতুন করে তোলেন শিল্পী। মালার্মে যেমন একদিন ভাবতেন শব্দের যে ব্যবহারিক অর্থ তাকে বিচ্ছিন্ন এবং অর্থহীন প্রতিপন্ন করার জন্যই শব্দের ব্যবহার। আগারহীনতাই তার পরিচয়।

জীবনধারণের মতো সহজ নয় জীবনযাপন, আরো সহজ নয় যাপনের গতিছন্দকে অনুধাবন এবং তার ভাষাগত প্রকাশ। আত্মজীবনীতে অতীতের কথা বিবৃত হয় বর্তমান কথকের মুখে; বক্তাই হয়ে যান চরিত্র। আবার সে চরিত্র চিত্রণে সাম্রাজ্যজুড়ে বসে অহং। নিজের থেকে নিজেকে ছাড়িয়ে নেবার আয়োজনে প্রতিমুহূর্তে সচেতন থাকতে হয় অন্য আমিকে। শব্দযোজনা আর শব্দভাঙার নিরন্তর প্রক্রিয়ার মধ্য দিয়ে আমি কর্তাব্যক্তিটি টুকরো টুকরো ছড়িয়ে পড়ে নগ্ন স্পেসে ; তখন বহির্বিশ্বের উন্মোচনই হয়ে ওঠে জীবনের উদ্‌যাপন। লিখতে লিখতে পাল্টে যায় লেখার নিয়ম; অবলীলায় লঙ্ঘিত হয় ছককাটা গণ্ডীঘর। কিন্তু কোন উৎকেন্দ্রিক উন্মাদনায় নয় বরং পরিকেন্দ্রিক বুনন সৌকর্যে টুকরো, আপাত ছিন্নতাই জন্ম দেয় সংঘের – রেখার সমন্বয়ে গড়ে ওঠে অবয়ব।

আত্মানুসন্ধানের প্রথম পর্বেই উত্তম পুরুষ (আমি-পক্ষ) কে অপসারিত করেছেন বিনোদবিহারী। আলোর জগতে অন্ধকারের প্রতিনিধি যেদিন মস্ত জাদুকরের ভেল্কি দেখতে এল সেদিন থেকেই রুদ্রনারায়ণ হয়ে উঠল কত্তামশাই।

— রুদ্রনারায়ণ, কোথায় তুমি ?

— আমি তোমার পায়ের তলায় পাতাল-গঙ্গায় ভেসে যাচ্ছি, আমায় টেনে তোলো।

— তুমি কোথায় আমি দেখতে পাচ্ছি না। আমার টর্চ তুমি নিয়ে গেছ। আর তুমি এখানে এসে করবেই বা কী ?

Scanned with CamScanner

— কেন ! আমার মতো করিৎকর্মা লোক কিছুই করতে পারবো না! তার মানে ?

রুদ্রনারায়ণ, এ বড় কঠিন স্থান। কেবলই সংঘাত। রুদ্রনারায়ণ, তোমার জোড়া চোখের দৃষ্টিতে কিছুই পাবে না তুমি। তুমি দেখেছ বহুরূপীর মৃত্যু — আর দেখেছ আলোছায়ার জলতরঙ্গ খেলা। আমি পাই আমার দশ আঙুল দিয়ে কঠিন ধারালো মসৃণ বর্ণহীন জগৎ। সেখানে আছে বর্ণহীন কোলাহল — অশরীরী কন্ঠস্বর। গন্ধ স্পর্শ শব্দ আর রূপ এর মধ্যে কোনো প্রত্যক্ষ সম্বন্ধ আমার জগতে নেই।" খণ্ড-আমি বা Persona-র এই আর্বিভাব বাংলা জীবনী সাহিত্যকেও অজানা এক জগতের অভিজ্ঞতায় সমৃদ্ধ করেছে। যে রুদ্রনারায়ণের সঙ্গে তাঁর দুর্লঙ্ঘ্য দূরত্ব; তারই বন্ধু-বান্ধবদের কাছে কত্তামশাই যেন পৌঁছে দিতে চান তাঁর আত্মবিনির্মাণের গল্প।

কত্তামশাই যে অনন্য ভাষাদক্ষতায় প্রতিমার গড়ে ওঠা; শিল্পীর ছোঁয়া-কে সঞ্চারিত করে দেন পাঠকের হৃদয়ে তার তুলনা দুর্লভ। বস্তুত দৃষ্টিশক্তির ক্ষীণতা এবং পূর্ণ অন্ধত্ব – এই সব দুর্বলতাকেই তিনি যেন করে তুলেছেন তাঁর ভিন্ন সবলতার পাথেয়। বহুরূপীর মৃত্যু তাঁকে পৌঁছে দেয় সেই তটস্থ অবস্থানে যেখান থেকে আত্মজীবনীও হয়ে উঠতে পারে ভিন্ন এক সৃষ্টি-স্বাক্ষর। নামের বন্ধন অতিক্রম করে সে হয়ে ওঠে সর্ব-নাম।

— তোমার সেই ব্যাধি এখনো সারে নি। 'রুদ্রনারায়ণ' 'কত্তামশাই' দুই নামের ঠোকাঠুকিতে অনেকদিন হা-হুতাশ করেছ।
— আজ আর হা-হুতাশ করি না।

তাই আকারহীন বর্ণহীন অসীম শূন্যতার মধ্যে একদিন ভেসে যান কত্তামশাই। আসে কীর্তিকর। সঙ্গে কথক থাকে - কিন্তু সে যেন নিজের সঙ্গে কথা বলা। কথক নয় কীর্তিকরই কেন্দ্র। তার কোন নির্দিষ্টতা নেই, নেই বলেই তার কথা বড় বেশি করে মনে পড়ে। বলেছিলুম 'কীর্তিকর এ কী গাছ?' সে বলেছিল 'এ গাছের কোনো নাম নেই।' বলেছিলুম 'গাছ! অথচ তার কোন নাম নেই!' কীর্তিকর বলেছিল 'কেন? তুমি Abstract Art -এর তত্ত্ব জান না ?' আত্মকথনও কি তবে হয়ে উঠতে পারে Abstract Art? বুড়োর নাতি জিজ্ঞাসা করবে 'সেই বড় গাছটা

Scanned with CamScanner

কোথায় ছিল ?' বুড়ো বলবে 'ঐ হোথা। ঐ হোথা - ঐ অদ্দূর পর্যন্ত, আকাশ পর্যন্ত গাছটা উঠেছিল।' গাছটা ঐভাবেই বাহিত হবে প্রজন্মের পরম্পরায়। কীর্তিকর ঠিকই বুঝেছিল 'বস্তু যেটা সেটা অসার, সেটা অনিত্য। আর ঐ ফাঁকা যেটা সেটাই নিত্য।'

রচনাকাল অনুযায়ী বিনোদবিহারীর জীবনী রচিত হয়েছে বিপ্রতীপ সময়ের পথে। লক্ষ্যণীয় ভাষা ব্যবহারেও মান্য হয়েছে এই বিপ্রতীপের সূত্র। নৈব্যক্তিক ভাষা পোশাক ত্যাগ করে 'চিত্রকর' এসেছেন সাধারণ স্মৃতিকথন রূপে। যদিও জন্মগত দৃষ্টি-দুর্বলতা সত্ত্বেও 'দেখ' ক্রিয়াপদের অতিরিক্ত ব্যবহার চোখে পড়ার মতো। স্মৃতির ধূসর আলোতে নিজের শৈশবকে দেখার সূচনা বহুপূর্বে — শৈশবকাল থেকে একদৃষ্টে তাকিয়ে তাকিয়ে দেখবার অভ্যাস আমার হয়েছিল।

বাড়ির লোক বলল 'দেখে আয় তো বাইরে কে ডাকছে ?' আমি ভেতরে গিয়ে বলতাম 'একটা লোক, সবুজ পাড় কাপড়, একটা কোট ও গায়ে চাদর, হাতে লাঠি।' অভিভাবকরা অধৈর্য হয়ে বলতেন 'নাম জিজ্ঞেস করেছিস ?' বলতাম, 'না, নাম তো জিজ্ঞেস করা হয়নি!' কীর্তিকরও গাছের কথা বলেছিল, নাম বলে নি।

হয়তো এভাবেই আত্মজীবনী হয়ে উঠতে পারে সর্বজনীন যাপনবৃত্তান্ত। "সমাজের নানা স্তরের দর্শক নানাভাবে শিল্পের বিচার করেন। কাজেই কোনো শিল্পরূপ যে সমাজের সকল ব্যক্তিকে সমানভাবে আকৃষ্ট করবে এমন সম্ভব নয়।" তাই নির্দিষ্ট কোন ব্যক্তিত্বের উন্মোচন নয় নৈব্যক্তিক প্রকাশন প্রেরণাই বড় হয়ে ওঠে শিল্পীর কাছে। স্বয়ং নিয়তি যেভাবে কত্তামশাইকে বলেছিল — তোমার সৃষ্টিও তো আইন ও আইন নেই এই দুয়ে মিলে হয়েছে।

Scanned with CamScanner

বিনোদবিহারীর শিল্প-জিজ্ঞাসা : একটি আলোচনা

পারভেজ কবীর

"শক্ত মোমের তাল হাতের উত্তাপে রৌদ্রের ঝাঁঝে ধীরে ধীরে নরম হয়ে আসছে, আঙুলের চাপে বস্তুটার আকার প্রকার বদলে যাচ্ছে। [...] এইভাবে মোমের তাল নিয়ে নাড়াচাড়া করতে করতে একদিন তার মধ্যে দিয়ে বেরিয়ে এল একটা আকার, মানুষ কি বাঁদর ঠিক ঠাওর করতে না পারলেও এটা যে বস্তুপিণ্ডের স্বাভাবিক আকার থেকে ভিন্ন, তা বুঝতে অসুবিধা হচ্ছে না। এইভাবে টেপাটেপি করতে করতে একদিন মোম থেকে বেরিয়ে এল একটা মানুষের আকার।"[১]

এই হল 'শিল্প-জিজ্ঞাসার' শুরু। প্রথমটা পড়ে অবাক লাগে, এহেন এক বিশাল রচনা - যাতে লেখক শিল্পের প্রায় সমস্ত দিক নিয়েই আলোচনা করেছেন, তার ভূমিকা এরকম অ-প্রাসঙ্গিক হয় কি করে ? এদেশে শিল্প-সংক্রান্ত আলোচনার অভাব নেই। অবনীন্দ্রনাথের 'বাগেশ্বরী' থেকে নন্দলালের 'দৃষ্টি ও সৃষ্টি' হয়ে হাল আমলে গীতা কাপুরের "When was modernism ?", শিল্পের তাত্ত্বিক ও নান্দনিক দিকগুলি নিয়ে বহু গুরুত্বপূর্ণ রচনা আমরা পেয়েছি। লক্ষ্য করার মতো বিষয় হল, প্রায় সবক্ষেত্রেই লেখকরা একটা সরল তাত্ত্বিক কাঠামো দাঁড় করান, যার সাহায্যে একটা শ্রেণী বিভাজনের মধ্যে দিয়ে মূল বিষয়টির বিভিন্ন অংশে আলাদা আলাদা করে বিচার, বিশ্লেষণ করা যায়। উদাহরণ স্বরূপ — "When was modernism" বললে - একটা সময়ের প্রসঙ্গ ওঠে, আলোচনার ফ্রেমটা হয়ে যায় লম্বা, সম্পূর্ণ ভার্টিকাল - এবং তা লেখককে সাহায্য করে 'আধুনিকতা'কে ইতিহাসে জায়গামত সেঁটে দিতে। একই প্রশ্ন যদি আমরা একটু ঘুরিয়ে করি - "What was modernism", ফ্রেমটা তাহলে হয়ে যায় অনেক বড়, বিস্তৃত এবং ইতিহাসের সঙ্গে যুক্ত হয় বোধ, চেতনা ও আরও অনেক প্রশ্ন যার সদুত্তর এত সহজে দেওয়া যায় না। আসলে সময় যে স্রেফ ইতিহাস নয়, শিল্পের রূপকেও ধীরে ধীরে গড়ে তোলে, নতুন আকার দেয়-এ ব্যাপারটি সত্যিই তাত্ত্বিক আলোচনার অংশ নয়, বরং অনেক বেশি করে উপলব্ধির অংশ।

---

[১] 'শিল্প-জিজ্ঞাসা', বিনোদবিহারীর সমস্ত বক্তব্য এই রচনারই বিভিন্ন অংশ থেকে নেওয়া।

Scanned with CamScanner

বিনোদবিহারীর 'শিল্প-জিজ্ঞাসা' শুরুই হয় এই উপলব্ধির জগৎ থেকে . . . শিল্পীর হাতে এক মোমের তালের বিবর্তনের মধ্য দিয়ে। হাতের উত্তাপে আকারহীন মোমের তাল যেমন ধীরে ধীরে বিবর্তনের পথে বাঁদরের রূপ থেকে মানুষের রূপে রূপান্তরিত হয়, তেমনই তাঁর আলোচনা এক অধ্যায় থেকে অন্য অধ্যায়ে ধীর লয়ে চালিত করে আমাদের। জড়ানো পটে আঁকা ছবির মতো চোখের সামনে উঠে আসে একের পর এক প্রসঙ্গ, আর খুলে যেতে থাকে ছবির জগতের নতুন নতুন প্রবেশপথ।

মূল রচনায় প্রবেশ করার আগে আরও একটা বিষয়ের আলোচনা করা প্রয়োজন। আমরা জানি ভারতীয় শিল্পে একটা সময় আধুনিকতা আর জাতীয়তাবাদ প্রায় একসঙ্গে পদক্ষেপ ফেলেছিল। রবিবর্মা, অবনীন্দ্রনাথ, নন্দলাল - এঁদের সকলেরই জীবনের একটা বড় অংশ জুড়ে ছিল স্বদেশী ও শিল্পের দেশীকরণ। বলাই বাহুল্য, শান্তিনিকেতনও এই হাওয়া থেকে মুক্ত ছিল না, যদিও এখানে, শিল্পের দেশীকরণ ছিল রবিবর্মা, অবনীন্দ্রনাথের স্বদেশীয়ানার চেয়ে অনেক আলাদা - অনেক বেশি অন্তর্মুখী। এবং এক্ষেত্রেও বিনোদবিহারী ছিলেন কিছুটা দলছুট, নিস্পৃহ। তাঁর নিজের কথামতো - স্বভাবগত নিস্পৃহতার জন্য তিনি সেই সময়ের মূলস্রোত থেকে সরে দাঁড়িয়েছিলেন। পাশাপাশি এও লক্ষ্যণীয়, তাঁর এ সময়ের কাজেও যে পরিমাণে নীরবতা লালিত হচ্ছিল, তা হয়ত বাইরের আধুনিকতার উচ্ছাসের সঙ্গে খুব একটা মানানসই হত না। তাছাড়া আধুনিক শিল্প ইতিহাসের যা অন্যতম বৈশিষ্ট্য, 'শৈলী নির্ভর আন্দোলন' - তার জন্যও বিনোদবিহারী ছিলেন বেমানান - কারণ তাঁর ছবির ভাষাও শৈলীনির্ভর হয়ে ছিল না কোনো কালে। দূরপ্রাচ্যের কালিতুলির কলাকৌশল যেমন তিনি কষ্ট করে রপ্ত করেননি, তেমনই সরে দাঁড়িয়েছেন, অজন্তা শৈলী কপি করার প্রস্তাবে। এর কারণ শুধু নিস্পৃহতা নয়, শিল্পভাষের প্রতি তাঁর ব্যক্তিগত মনোভাব যা কোনরকম প্রতিরূপায়ণ [Representation] নির্ভর হয়ে ছিল না কোনোদিন। আজ তাঁর ছবি দেখলে বোঝা যায় কি গভীর রূপবোধ ও অর্ন্তদৃষ্টি দিয়ে তিনি আহরণ করেছিলেন এক একটি শিল্পভাষ, সরাসরি কোনো শৈলী প্রতিরূপায়িত না করেও কি করে সেই ভাষার ভেতরকার ভাব ও রসকে উপস্থাপিত করেছিলেন নিজের ছবিতে। এই সুসংযত অন্তঃকরণই প্রকাশ পেয়েছে 'শিল্প জিজ্ঞাসা'র প্রতিটি আলোচনায় আর

Scanned with CamScanner

সম্ভবতঃ এই কারণেই, শুধু শিল্পচর্চা নয়, ভারতীয় শিল্পের ক্রম বিবর্তনের প্রসঙ্গেও এই রচনা গুরুত্বপূর্ণ, যা সম্পূর্ণ নতুন এক দৃষ্টিকোণ থেকে আমাদের শেখানো ইতিহাসকে আবার নতুন করে দেখতে শেখায়।

রচনার শুরুতেই আমরা দেখি, একটা সংক্ষিপ্ত ভূমিকায় [পৃঃ ১২৪-১৩৬] শিল্পের তাত্ত্বিক দিকগুলিকে অতিক্রম করে লেখক পৌঁছে যান শিল্পের ভাষার প্রসঙ্গে। কতকটা আত্মকথনের ঢঙেই তিনি বলেন - "বাস্তব সত্যের সঙ্গে শিল্পের মিল খুঁজতে যাওয়াটা পণ্ডশ্রম, শিল্পের নিজস্ব সত্তা উপলব্ধি করার সঙ্গে দর্শক শিল্পের যুক্তি উপলব্ধি করে থাকেন।" অতঃপর শিল্পের নিজস্ব সত্তার প্রসঙ্গ উঠে আসে যা তাঁর ভাষায় - মূলতঃ ভাবপ্রধান। ভাবকে ভাষায় প্রকাশ করতে গেলে প্রয়োজন হয় কিছু উপাদানের, এবং যে কোনো দেশের শিল্পের উপাদানগত বিশ্লেষণ করলে শেষ পর্যন্ত পাওয়া যাবে দুটি মৌল উপাদান - আকার ও ভঙ্গি। ছবির ভাষা ও ভাবের বিভিন্নতা তথা বৈচিত্র্য যে এই দুই উপাদানের দ্বারা অনেকাংশে নির্মিত - এই ব্যাখ্যা উঠে আসে তাঁর পরবর্তী আলোচনায় যখন তিনি উদাহরণস্বরূপ অবতারণা করেন বিভিন্ন দৃষ্টান্তের। এই প্রসঙ্গে একটি তুলনা উল্লেখ্য, যখন তিনি বলেন, যে স্থির অবস্থায় হরিণ এবং দ্রুত ধাবমান হরিণের মধ্যে আকারগত মিল থাকলেও, গতির পার্থক্যে উভয়ের মধ্যে আবেগ ও উদ্দীপনার পার্থক্য দেখা যায়। সুতরাং আকারগত বাস্তবতাকে প্রথমেই অতিক্রম করে তিনি অবতারণা করেন অনেক বেশি ভাব প্রধান বাস্তবতার – যা গভীরভাবে শিল্পভাষের মধ্যে নিহিত। তাঁর নিজের মতে – এই বাস্তবতাই প্রকৃত বাস্তবতা। কারণ এরই প্রয়োগে ছবি হয়ে ওঠে সজীব, প্রাণবন্ত। আলোচনার শেষে তিনি বলেন কিভাবে একটি তুলির টান আকার ও ভঙ্গির মাধ্যমে "শূন্য পটে জীবনপ্রবাহের সঞ্চার করে তোলে"। এভাবে শুরু থেকেই আমাদের চোখের সামনে উঠে আসে এক রূপনির্ভর আলোচনা, যা ভীষণভাবে শিল্পের ভাষা ও তার উপাদানগত চরিত্রকে উন্মোচিত করে।

এটা সত্যি যে বিনোদবিহারীর এই রূপনির্ভরতা একান্তই ব্যক্তিগত ছিল না, তা হয়ত সব মিলিয়ে শান্তিনিকেতনের শিল্প চর্চারই এক চরিত্র। তবে নন্দলাল ও অন্যান্যেরা এই 'ফর্মালিসম' মূলতঃ বুঝেছিলেন শৈলী ও ঐতিহ্য বিশেষে - যে কারণে 'দৃষ্টি ও সৃষ্টি' রচনায় আমরা তাঁকে বারবার ফিরে যেতে দেখব 'সাদৃশ্য'

Scanned with CamScanner

গুণের আলোচনায়, যেখানে চর্চার মেরুদণ্ডই হয়ে উঠবে চাক্ষুষ বিশ্লেষণ। তুলনায় সম্পূর্ণ ভিন্ন দৃষ্টিকোণ থেকে বিনোদবিহারী প্রবেশ করেছেন এই একই বিষয়ের আলোচনায়। নন্দলালের মতোই তিনি অনুসন্ধান করেছেন বিভিন্ন বিমূর্ত বিষয়ের যা এই উপাদানগুলিকে গড়ে তোলে একটা সম্পূর্ণ ছবিতে। আলোচনা করেছেন কিভাবে দুটি রেখার মধ্যে একটা অদৃশ্য চৌম্বক ক্ষেত্র তৈরি হয় যা চারপাশের শূন্য জমিতেও অদৃশ্য ঢেউ তুলতে পারে। দুজনেই বলেছেন ছবির উপাদানগুলির পেছনে কাজ করা অদৃশ্য শক্তির কথা, যেমন কর্ষ শক্তি, সন্নিকর্ষ শক্তি প্রভৃতি। কিন্তু দুজনের ক্ষেত্রেই এই উপলব্ধির পথ ছিল সম্পূর্ণ আলাদা। নন্দলালের অসামান্য রূপবোধ যেমন তাঁকে শূন্য জমিতেও শিল্পের উপাদানগত বৈশিষ্ট্য প্রত্যক্ষ করতে শিখিয়েছিল, বিনোদবিহারী তেমনই ইন্দ্রিয় দিয়ে উপলব্ধি করেছিলেন চারপাশের শূন্যতাকে। তাই 'সন্নিকর্ষ শক্তি'র মতো বিমূর্ত বিষয়ের আলোচনায় তিনি বলেন : "ফুল সাজানো ফুলদানির সকাল থেকে সন্ধ্যার মধ্যে আলোর পরিবর্তনের সঙ্গে সঙ্গে রঙেরও বিবর্তন ঘটছে। রাত্রির গাঢ় অন্ধকারের মধ্যে ফুল সমেত ফুলদানি স্পর্শের সাহায্যে জানতে গিয়ে এক নতুন অভিজ্ঞতার সম্মুখীন হই আমরা। জানতে পারি পাপড়ির মসৃণতা, নমনীয়তা, ফুলদানির রুক্ষতা [...] অপরিচিত স্থানে চলতে গিয়ে অবস্থাটা আরও তীব্র হয়ে ওঠে। তখন কেবলই সংঘাত কঠিন, কর্কশ, মসৃণ বস্তুর সঙ্গে, সংক্ষেপে অন্ধকারের বস্তু মাত্রেই বিচিত্র আকার নিয়ে আমাদের সমস্ত শরীরকে সচকিত করে তোলে। [....] এই স্পর্শের দ্বারা সচকিত শরীরের সন্ধি-স্থানের সঙ্গে যুক্ত হয়ে যে অভিজ্ঞতা আমরা অর্জন করি - তারই নাম সন্নিকর্ষ শক্তি।"

এখানেই বিনোদবিহারী সম্পূর্ণ স্বতন্ত্র। আসলে, দেখা ও চেনার মধ্যে যে সূক্ষ্ম ফারাকটা আমাদের স্বাভাবিক দৃষ্টিকে এড়িয়ে যায়, তাঁর ব্যক্তি জীবনে সেই ব্যবধানটা হয়ে উঠেছিল অলঙ্ঘনীয়। দেখা বা আরও বেশি করে চেনা, আমাদের, আমাদের চারপাশের পৃথিবীটা থেকে আলাদা করে দেয়, আমরা আমাদের অবস্থানের সাপেক্ষে বুঝি নিই চারপাশের পৃথিবীর সমস্ত বস্তু কোথায় কোন অবস্থানে রয়েছে। বিনোদবিহারীর ক্ষেত্রে, তাঁকে সবসময় যুঝতে হত একটা জমাট বাঁধা শূন্যতার সঙ্গে, যে শূন্যতার একটা টুকরো অংশ ছিলেন তিনি নিজেও। তাঁর উপরোক্ত ব্যাখ্যার মতোই, তাঁর এ সময়ের কাজে আমরা দেখব কিভাবে একটা

Scanned with CamScanner

শূন্য জমিতে একের পর এক আঁচড় কেটে তিনি খোঁজার চেষ্টা করছেন, তাঁর কাঙ্ক্ষিত বস্তুরূপের। কিভাবে তাঁর প্রত্যেকটা রেখা ফিরে আসছে তার শুরুর অবস্থানে, যেন তাকে আশ্বস্ত করছে যে সে সত্যিই হারিয়ে যায়নি। বাস্তবিকই তখন তাঁর তুলি তাঁর কাছে হয়ে উঠেছিল হাতেরই বর্ধিত অংশ, হাতের গতিবিধির সাহায্যে তিনি উপলব্ধি করতেন তুলির গতিবিধি, আর তার সাহায্যে সেই তুলির টানে গড়ে ওঠা বস্তুরূপের। শুধু চোখে দেখে নয়, শিল্পের রূপ, তার ভাষা এসব তিনি অনুভব করেছিলেন তাঁর শরীর, তাঁর ইন্দ্রিয়ের সাহায্যে। সম্ভবত এই কারণেই রচনার অনেকাংশে আমরা দেখতে পাই তাঁর আলোচনা দৃশ্যজনিত বোধের থেকে ক্রমশ দূরে সরে যাচ্ছে, আর আমাদের টেনে নিয়ে যাচ্ছে অনেক বেশি করে স্নায়বিক, শারীরিক ও স্পর্শজনিত (haptic) উপলব্ধির পথে . . .।

রচনার দ্বিতীয় অংশে (পৃঃ ১৩৬-১৫২) আমরা দেখব, বিচার বিশ্লেষণ নয় - বরং টুকরো টুকরো মতামত দিয়ে শিল্পের চারপাশের জগৎটাকে তুলে ধরেছেন লেখক। এখানে তিনি আলোচনা করেছেন সমাজ, পরিবেশ, শিল্পীর স্বাধীনতা, দর্শক ও শিল্প শাস্ত্রের মতো বিষয়ের যা শিল্পসৃষ্টির সঙ্গে অঙ্গাঙ্গিভাবে জড়িত। এখানে তাঁর আলোচনা খুবই সরল ও তা পুনরায় উল্লেখ বা ব্যাখ্যা করার কোনো প্রয়োজন দেখি না। শুধু একজায়গায় তাঁর মন্তব্য বেশ কৌতূহলজনক। সামাজিক পটভূমিকার পরিবর্তন নান্দনিক বা রুচি বোধেরও কতটা বদল ঘটায় তার প্রসঙ্গে তিনি উল্লেখ করেছেন বিংশশতাব্দীর প্রথমার্ধের শিল্প আন্দোলনের। ঊনবিংশ শতাব্দীর ইউরোপীয় শিল্পীরাও নিগ্রো ও অন্যান্য অজানা ঐতিহ্যবাহী শিল্পকে বর্বর আখ্যা দিয়েছিলেন, যা সম্পূর্ণ অন্য আকার ধারণ করে বিংশ শতাব্দীতে যখন পিকাসো, হেনরি মুর ও মদি গ্লিয়ানির মতো শিল্পীরা এই সমস্ত শিল্পকেই মূলধন করে নিজেদের শিল্প সৃষ্টি করেন। বিনোদবিহারীর মতে, এটা শিল্প ইতিহাসের এক গুরুত্বপূর্ণ পট পরিবর্তন, যার মধ্যে দিয়ে পাশ্চাত্যের শিল্পরুচি একটা বড় অসম্পূর্ণতাকে অতিক্রম করে আধুনিকতার পথে, পূর্ণতার পথে অগ্রসর হয়। যা বিনোদবিহারী উল্লেখ করেননি, তা হল - এই বড়সড় পালাবদলও আসলে শুধু রুচিবোধের পরিচয় দেয় না, বরং অনেক বেশি করে সে যুগের মূলস্রোতের গতিবিধির দিকনির্দেশ করে। বিংশ শতাব্দীতেই আমরা দেখি হাতিয়ারের সাহায্যে ঔপনিবেশিক আগ্রাসনের চেয়েও বড় আকার ধারণ করে পণ্যসামগ্রীর দ্বারা বাণিজ্যিক তথা

Scanned with CamScanner

সাংস্কৃতিক আগ্রাসন। আর এই আগ্রাসনেরই আর এক রূপ কি বেরিয়ে আসে না এই সময়কার নতুন, 'আধুনিক' - শিল্পচেতনায় - যা প্রাচ্য শিল্পকে রূপান্তরিত করে ঘর সাজানোর পণ্যদ্রব্যে, আর পোলকের ছবিকে রূপান্তরিত করে উচ্চবিত্তের ধ্যানসামগ্রীতে। এটা ঠিকই, চল্লিশ বছর আগে এ বিষয়গুলো নিয়ে বিনোদবিহারীর খুব গভীরে চিন্তাভাবনা করার অবকাশ ছিল না, এবং শুধু কানে শুনে সমসাময়িক শিল্প সম্পর্কে ধারণাও তাঁর খুব একটা পরিষ্কার ছিল না। সেক্ষেত্রে, তিনি নিজের মতো করে প্রাচ্য বা পাশ্চাত্য শিল্পকে কতকগুলি বিভাগে সাজিয়েছিলেন। উদাহরণস্বরূপ - পাশ্চাত্য আধুনিক শিল্পকে তিনি ভাগ করেছিলেন দুই অংশে - বিজ্ঞান আশ্রিত শিল্প এবং বির্মূত শিল্প। বাস্তবে এই বিভাগগুলি খুবই আবছা এ বিষয়েও কোনো সন্দেহ নেই, কিন্তু লক্ষ্য করার মতো বিষয় হল, এর পরেই যখন তিনি ফিরে আসেন এই সমস্ত শিল্পের ভাষার প্রসঙ্গে, আমরা দেখি বেশ কিছু তীক্ষ্ম ও গভীর পর্যবেক্ষণ, "ইয়োরোপ বিমূর্ত বলতে বস্তুরূপে বিশ্লেষণ করেছে এবং কতকগুলো মৌল আকারকে বিমূর্ত বলে স্বীকার করেছে। সমগ্রভাবে দৃষ্টিভঙ্গি বিশ্লেষণ মূলক। প্রাচ্যে বিমূর্ত বলতে বিশেষ উপলব্ধিকে বুঝেছে। এ হল নতুন রকমের অভিজ্ঞতা বা নতুনের চেতনা।"

অতঃপর তাঁর টুকরো আলোচনা এগিয়ে যায় অন্যান্য বিষয়বস্তুর [পৃঃ১৫২-১৬৮] পথে যা আধুনিক শিল্পকে কোনো না কোনো ভাবে প্রভাবিত করেছে। প্রযুক্তি, মনোবিজ্ঞান, পরাবাস্তবতা প্রভৃতি বিষয়ের ক্ষেত্রে প্রসঙ্গক্রমে তিনি টেনে আনেন বিভিন্ন শিল্প আন্দোলনের কথা যথা - ফিউচারিসম, ডাডাইসম ও সাররিয়ালিসম। এই সমস্ত শিল্পকেই তিনি যন্ত্রসভ্যতার ফসল হিসেবে দেখেন যা কোনো না কোনোভাবে প্রযুক্তিবাদী যন্ত্রযুগের ঘূর্ণিপাকে অবরুদ্ধ। পাশাপাশি তিনি আলোচনা করেন সোভিয়েতের বাস্তববাদী শিল্পের এবং এক্ষেত্রেও তিনি তার সম্বন্ধে খুব একটা উঁচু মত পোষণ করেন না। রুশ শিল্পের বিষয়বস্তু অনেক বাস্তববাদী ও মাটির কাছাকাছি হলেও, রূপের প্রশ্নে তিনি তার মধ্যে কোনো নান্দনিক উৎকর্ষ দেখেন না, বরং অনুমান করেন অত্যধিক বাস্তবঘেঁষা হতে গিয়ে রুশ শিল্পীরা তাঁদের কাজে জীবনের মূল্যকে সংকীর্ণ করে তুলেছে। আজ আমরা জানি, বিষয়বস্তুর প্রতি অতিরিক্ত নির্ভরতা কি করে রুশ শিল্পের ভাষার ধার ও রূপের উৎকর্ষকে ক্ষতিগ্রস্ত করেছিল। শিল্পের ভাষা যে স্রেফ মহৎ আদর্শকে রূপায়ণ করলেই গড়ে

Scanned with CamScanner

ওঠে না, রচনার এই অংশে বিনোদবিহারী তার একটা প্রচ্ছন্ন আভাস দেন। এখানে আমরা আরও একটি উদাহরণ যোগ করতে পারি। শুধুমাত্র বৈপ্লবিক বিষয়বস্তু নিয়ে ছবি আঁকলেই যে সে ছবি বৈপ্লবিক হয়ে ওঠে না এ ব্যাপারটা অনেকের মতো হিটলারও বুঝেছিলেন, ১৯২০ সালে। সেই সময়ের জার্মানীতে, যাদের ছবি হিটলারকে সবচেয়ে আশঙ্কিত করে তুলেছিল, তাঁরা মূলতঃ ছিলেন বিমূর্ত শিল্পী। কোনোভাবে হিটলার বুঝেছিলেন, এর বিষয়বস্তু দুর্বোধ্য হলেও এর উপস্থিতি তাঁর একনায়কতন্ত্রের প্রতি একটা বড় সাবধানবাণী, কারণ এই শিল্প শুধু ভাষার নতুনত্ব দাবী করে না - স্বাধীন ব্যক্তিচেতনারও উন্মেষ দাবী করে। আধুনিক শিল্প ও সমাজের এই আশ্চর্য সম্পর্ক বিনোদবিহারীকে যথেষ্ট ভাবিয়ে তুলেছিল, আর সে কারণেই এই অংশে আমরা তাঁকে দেখব কিছুটা অনিশ্চিত অবস্থানে। তাঁর নিজের ভাষায়, "প্রগতিশীল সমাজের মধ্যে শিল্প অনেক পরিমাণে প্রতিক্রিয়াশীল। এক্ষেত্রে ব্যক্তিগত পরীক্ষা-নিরীক্ষার সুযোগ অপেক্ষাকৃত সংকীর্ণ। একথা স্বীকার করতে হবে খ্রীষ্টীয় শিল্পও এক ধরনের প্রচার শিল্প। তাহলে পার্থক্য কোথায় ? জবাবে বলতে হয়, প্রাচ্য-পাশ্চাত্য উভয়ের ধর্মীয় শিল্পে বাস্তব ও বিমূর্ত উভয় দিকের সংযোগ ঘটেছিল একটি আদর্শকে কেন্দ্র করে। আধুনিক সমাজবাদের আদর্শের এই ব্যাপকতা আছে কিনা জানি না।"

রচনার শেষ অংশে [১৬৮-২০১] বিনোদবিহারী প্রবেশ করেন ভারতীয় শিল্পে। তিনি আলোচনা করেন, উপমহাদেশের শিল্প-ইতিহাসে, একেবারে আদিকাল থেকেই কি করে নির্দিষ্ট কিছু লক্ষণ দেখা যায়, যথা ছন্দ, বিমূর্তভাব - যা স্থান কাল নির্বিশেষে উপমহাদেশের শিল্পকে অন্যান্য ঐতিহ্যবাহী শিল্পের থেকে স্বতন্ত্র করে তুলেছে। তিনি এও আলোচনা করেন যে, ভারতীয় শিল্পীরা বাস্তবতা বলতে মূলতঃ বুঝেছিলেন প্রাণবন্ততাকে, যে কারণে কোনোরকম দৃষ্টি বিভ্রমোচিত [Illusionistic] উপস্থাপনার পথে না গিয়ে - তাঁরা শুধু অভিব্যক্তি ও ছন্দের মাধ্যমে একরকমের বাস্তবতাকে তুলে ধরেছেন। ভারতীয় ভাস্কর্যেও তাই আমরা ছন্দ ও অভিব্যক্তির একটা বিশেষ স্থান লক্ষ্য করি। এই প্রসঙ্গে তিনি ব্যাখ্যা করেন কিভাবে ভারতীয় ভাস্কররা নৃত্যরত শরীরকে এত দক্ষতার সঙ্গে উপস্থাপনা করেছেন। তিনি বলেন - নৃত্যের ক্রিয়া বিশেষভাবে মেরুদণ্ড ও শ্রোণীচক্রের সক্রিয়তার ওপর নির্ভর করে। এই দুই অংশকে কেন্দ্র করেই সমস্ত অঙ্গপ্রত্যঙ্গের মধ্যে দিয়ে সঞ্চারিত

Scanned with CamScanner

হয় দেহের দ্যোতনা। ভারতীয় ভাস্কর্যে আমরা দেখতে পাব এই দুই অংশকে যথাসম্ভব সক্রিয় অবস্থানে খোদাই করা হয়েছে। এর ফলে দেহের অন্যান্য অংশেও একটা সক্রিয়ভাব প্রকাশ পেয়েছে ও একরকমের 'দেহ-ছন্দে'র আবির্ভাব হয়েছে। এখানে লক্ষণীয়, একই বিষয়ের আলোচনাকালে অবনীন্দ্রনাথ যেখানে ভারতীয় শিল্পশাস্ত্রে বর্ণিত রীতি ও নীতির প্রতি সম্পূর্ণ বিশ্বাস বজায় রেখেছেন, বিনোদবিহারী সেখানে সম্পূর্ণভাবে বর্জন করেছেন সমস্তরকমের তাত্ত্বিক কাঠামোগুলিকে [ঐতিহ্য, ইতিহাস প্রভৃতি] এবং সরাসরি একজন সাধারণ দর্শকের চোখ দিয়ে বিচার করেছেন সমস্ত গুণাগুণের। এর খারাপ, ভালো দুটি দিকই তাই এই অংশে বেশ প্রকট হয়ে দেখা দিয়েছে। উদাহরণস্বরূপ তিনি যখন মহেঞ্জোদারোর নারীমূর্তির বর্ণনা করেন, তখন উল্লেখ করেন কি করে ভাস্কর শরীর সংস্থানগত বাস্তবতা না দেখিয়েও স্রেফ দেহের ভঙ্গির সাহায্যে মূর্তিটিতে একটা প্রাণবন্ততা এনেছেন। এটা যেমন সত্য, তেমন এও সত্য যে ভারতীয় শিল্পে, বিশেষতঃ গুপ্ত পরবর্তীকালে শরীর সংস্থানগত বাস্তবতার একটা বিশেষ স্থান ছিল। এই বাস্তবতার মানদণ্ড ছিল আলাদা, তাল, মান, মাত্রা, প্রভৃতি; যার সাহায্যে শিল্পে দেহজ বাস্তবতা নির্ণয় করা হত। তাই যেসব গুণাগুণকে আমরা বিমূর্ত বলে জানি, তা তার আসল সময়ে শাস্ত্র মতে বাস্তবগুণ বলেই পরিগণিত হত। বিনোদবিহারী অবশ্য এই জটিলতার মধ্যে যাননি এবং শিল্পের উপাদান ও ভাষাগত আলোচনার মধ্যেই নিজেকে সীমাবদ্ধ করে রেখেছেন।

ভারতশিল্পের প্রসঙ্গে আরও একটি বিষয়ের আলোচনাকালে তাঁর বক্তব্য উল্লেখ না করলে এই রচনা অসম্পূর্ণ রয়ে যাবে, তা হল - সাদৃশ্যগুণ। এ কথা আমি আগেও আলোচনা করেছি যে দেখা ও চেনার খুব স্পর্শকাতর পৃথিবীটাতে বিনোদবিহারীর অনুভব কতটা স্বতন্ত্র ছিল। ভারতীয় শিল্পে সাদৃশ্যগুণের আলোচনাতে তা আরও তীক্ষ্ম ও স্পষ্ট হয়ে ওঠে। অবনীন্দ্রনাথের সাদৃশ্যগুণের তাত্ত্বিক বিশ্লেষণকে তিনি সম্পূর্ণভাবে গ্রহণ করতে পারেন না, এবং নির্মাণ ও নির্মিতি - এই দুই গুণের পরাকাষ্ঠায় ফেলে তিনি এর সূক্ষ্ম দিকগুলির আলোচনা করেন। তিনি প্রথমেই বলেন, সাদৃশ্য ও সাদৃশ্যবর্জিত - এই দুই শিল্পেরই ধারণা সংস্কৃতি বিশেষে কতটা আলাদা। এদেশে সাদৃশ্য বলতেই আমরা রূপ বা আকারগত সাদৃশ্য ভেবে বসি - যেমন, মরাল গ্রীবা, করপল্লব, পদ্মপলাশলোচন প্রভৃতি। কিন্তু এগুলিকে সাদৃশ্য না

Scanned with CamScanner

বলে পরম্পরাগত পর্যবেক্ষণ বলাটাই তাঁর মতে বেশি সঙ্গত। বিনোদবিহারীর মতে সাদৃশ্যগুণ আরও গভীরে উপলব্ধি করতে হয়, তা শুধুই বস্তুরূপের মধ্যে সীমাবদ্ধ নয়। তাঁর নিজস্ব ব্যাখ্যার একটা অংশ এখানে তুলে ধরা যায়, "পায়ে চলা, সাপের চলা, লতার বেড়ে ওঠার মধ্যে গতির ঐক্য আছে। এগুলিকে জ্যামিতিক আকারে প্রবর্তিত করলে বস্তু থেকে ভিন্ন হয় না। কিন্তু যখন এই তিনটির মধ্য দিয়ে আর একটা বস্তু নির্মিত হয় তখন সেই বস্তুর রূপান্তর ঘটে এবং সেই মুহূর্তে আত্মপ্রকাশ করে সাদৃশ্য, অর্থাৎ পাশ্চাত্য শিল্পীরা যাকে বলছেন বিমূর্ত, প্রাচ্য শিল্পীরা তাকেই বলেছেন রূপান্তর।" এখানে আমরা যেন পড়তে পড়তে একটু হোঁচট খাই। বুঝতে পারি এই আলোচনা স্রেফ শিল্পের আলোচনা নয়, তা যেন উঠে এসেছে লেখকের ব্যক্তি চেতনার গাঢ় অন্ধকার জগৎ থেকে। ব্যাখ্যা নয়, টুকরো টুকরো অভিজ্ঞতার সাহায্যে তিনি বুঝতে ও বোঝাতে চাইছেন শিল্পের ভাষার সমস্ত খুঁটিনাটি, তুচ্ছাতিতুচ্ছ খবরাখবর। বিশ্লেষণ নয়, বরং একটা ব্যক্তিগত অন্তস্থঃকরণের দ্বারা তিনি শিল্পের সমগ্র রূপটা একসঙ্গে ধরার চেষ্টা করছেন। এখনও যখন আমরা বিনোদবিহারীর ল্যান্ডস্কেপগুলো নিয়ে তর্ক করি, বোঝার চেষ্টা করি তাঁর ভাষা, তাঁর শৈলী - এই আলোচনা যেন আবার নতুন করে প্রাসঙ্গিক হয়ে ওঠে। শিল্পী হিসেবে বহির্বিশ্বের সমস্ত রূপ, রীতি, শিল্পভাষ, তার উপাদানকে দেখতে দেখতে যেমন একটা রূপের আত্তীকরণ করেছিলেন বিনোদবিহারী, এ লেখাতেও তেমনই ঐতিহ্য, সময়, শৈলী নির্বিশেষে তিনি আলোচনা করেছেন শিল্পভাষের। এ লেখার শুরুতেই আলোচনা করেছিলাম, কোনোরকম তাত্ত্বিক কাঠামোকে বাদ দিয়ে, পরিচ্ছেদ-অনুচ্ছেদ নির্বিশেষে তাঁর লেখা এগিয়ে যায় এই রচনায়। তার মূল কারণ এটাই যে কৌতূহলজনকভাবে তিনি নির্বাচন করেছেন একটা বিস্তীর্ণ, লম্বা [Horizontal] ফ্রেমের - যে কারণে তাঁর রচনাও হয়ে উঠেছে অনেক বেশি প্রসঙ্গনির্ভর, বিষয়নির্ভর নয়। আসলে স্থপতি নয়, বরং এক পর্যটকের চোখ দিয়ে তিনি দেখেছেন শিল্পের এই সুবৃহৎ প্রতিষ্ঠানটিকে এবং একটা সম্পূর্ণ বিচ্ছিন্ন অবস্থানে থেকে তিনি চাক্ষুষ করতে চেয়েছেন শিল্প জগতের সমগ্র পরিধিটাকে।

'বিচ্ছিন্ন' বলাটা হয়ত ভুল হল, কারণ বিচ্ছিন্ন তিনি কোনোকালেই ছিলেন না। তবু 'শিল্প-জিজ্ঞাসা' পড়তে গিয়ে তার প্রতিটি অংশে আমরা কোথাও একটা

Scanned with CamScanner

বিষয়বস্তুর সঙ্গে শিল্পীর একটা দূরত্ব দেখতে পাই। বুঝতে পারি, লেখক/ শিল্পী কোনো অংশেই তাঁর বক্তব্য প্রতিষ্ঠা করার জন্য ব্যস্ত নন। বরং প্রায় স্মৃতি রোমন্থনের মতো করেই দূর থেকে দেখার চেষ্টা করছেন তাঁর ফেলে আসা জমির দিগন্ত রেখাকে। হয়ত এই আপাত-বিচ্ছিন্নতা তাঁর সারাজীবনের কাজের সঙ্গেই জড়িত। শান্তিনিকেতনের মতো দেশের প্রথম আধুনিক শিল্পপ্রতিষ্ঠানের মধ্যে থেকেও তাঁর ছবি যেমন মূলস্রোতের অভিমুখে বয়ে যায়নি, তেমনি এ রচনাও তাঁর একাকীত্ব, তাঁর শিল্পবোধ ও তাঁর গভীর নন্দনচেতনার বৃত্তেই গড়ে তুলেছে শিল্পের পৃথিবী। রচনার একেবারে শেষ পর্যায়ে এসে আমরা বুঝি - এই বৃত্ত কতটা বিষাদময়, নিঃসঙ্গ। সমস্ত প্রসঙ্গের শেষে বিনোদবিহারী উত্থাপন করেন সুন্দরের প্রসঙ্গ, সৌন্দর্যের আলোচনা। আমরা জানি, জীবনের শেষপ্রান্তে এসে বিনোদবিহারীর পরিচয় হয়েছিল সৌন্দর্যের সঙ্গে[২]। তিনি উপলব্ধি করেছিলেন সুন্দরের রূপ অনুভব করতে গেলে মূল্য দিতে হয়, কারণ সেই রূপ তীব্র, নির্মম। এই রচনার শেষ অংশে তাই সৌন্দর্যের মধ্যে আনন্দ ও বিষাদ - এই দুই রসেরই ইঙ্গিত দিয়েছেন তিনি। দূরপ্রাচ্যের সৌন্দর্যচেতনার আলোচনা করতে গিয়ে তিনি উপস্থাপন করেন এক জাপানী ছোট গল্পের। গল্পে এক জনের বাগানে 'মর্নিংগ্লোরি' ফুটেছে শুনে জাপানের সম্রাট তা দেখতে চান। গৃহস্বামী তাঁকে সাদরে নিমন্ত্রণ করে নিয়ে আসেন। সম্রাট বাগানে ঢুকে দেখেন বাগান শূন্য, কোথাও মর্নিংগ্লোরির চিহ্নমাত্র নেই। গৃহস্বামী শুকনো বাগানের মধ্যে দিয়ে সম্রাটকে নিয়ে গৃহে প্রবেশ করলেন। রাজা সেখানে গিয়ে দেখলেন একটি পাত্রে একটিমাত্র মর্নিংগ্লোরি। সম্রাট বুঝলেন মর্নিংগ্লোরির সৌন্দর্যকে তীব্রতর করে তোলার জন্য গৃহস্বামী তাঁর বাগানের আর সমস্ত গাছ তুলে ফেলেছিলেন। বিনোদবিহারীর মানসপটেও সৌন্দর্যের রূপ আঁকা হয়েছে নির্মমভাবে। তাঁর এ সময়ের কাজে আমরা দেখব কি পরিমাণে আঁচড় কেটে তিনি প্রাণপণ চেষ্টা করছেন একটা রূপ সৃষ্টি করার। অবচেতনে দূরপ্রাচ্যের ড্রাগনের সঙ্গে তর্ক করছেন তাঁর সারাজীবনের সৌন্দর্য সঞ্চয় নিয়ে[৩]। প্রচণ্ড টানাপোড়েনের মধ্যেও আঁকড়ে ধরতে চাইছেন যা কিছু সুন্দর - তাঁর সঞ্চয়, তাঁর সারাজীবনের সৃষ্টিকে। এই প্রচণ্ড হাহাকারের মধ্যেই তিনি আবার উপলব্ধি করছেন তাঁর শিল্পী

[২] 'কত্তামশাই' দ্রষ্টব্য।

[৩] 'কত্তামশাই' দ্রষ্টব্য।

সত্তাকে, তাঁর ব্যক্তিচেতনাকে - আর ফিরে আসছেন আবার তাঁর পুরনো পায়ে চলা পথে, তাঁর নিজের কথায়, "সৌন্দর্যের মানদণ্ড কালে কালে বদলে যাচ্ছে। সেই বিবর্তনের ইতিহাসে একটি কথা লোপ পায়নি। সেই কথাটি হল প্রাণশক্তি। প্রাকৃতিক সৌন্দর্য অথবা শিল্পসৌন্দর্য উভয়ের মধ্যে যোগসূত্র এখানে। গাছের কঠিন গুঁড়ি ভেদ করে বর্শার ফলার মতো লাল কচি পাতা বেরিয়ে আসছে। বলি কি সুন্দর, কি প্রাণশক্তি ! মাটি ভেদ করে সবুজ সতেজ ঘাস জন্মেছে। অনায়াসে পায়ে মাড়িয়ে পিষে দেওয়া যাবে, তবু ভাবের জগতে সেই সজীবতা অক্ষয় হয়ে থাকবে।"



বিনোদ দর্শন – শিল্প প্রক্রিয়ায় ব্যক্তি ও সমষ্টি

সঞ্চয়ণ ঘোষ

বোলপুর স্টেশন থেকে শান্তিনিকেতন, "কবিগুরু রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের পীঠস্থান", একটা রিক্সা নিয়ে নিন, এখন অবশ্য প্রাইভেট গাড়ি বা অটোরিক্সাও নেওয়া যায়। তারপর সোজা বোলপুর পুরানো বাজার, চৌরাস্তা, বোলপুর সুপার মার্কেট, বিচিত্রার বন্ধ সিনেমা হল পেরিয়ে শান্তিনিকেতনের পথে। রাস্তায় সবকিছুই চোখে পড়বে, ছোটখাট প্রতিদিনের জিনিসপত্রের দোকান, রাস্তার উপর আশেপাশের গ্রাম থেকে আসা হাতে বানানো মাদুর থেকে শুরু করে গন্ধেশ্বরীর দোকান, লোহালক্করের দোকান, হালফ্যাশনের লোকাল (local) অনুকরণে বানানো পোষাক, মরা সাহেবের পোষাক, মোবাইল,ভিনাইল বিজ্ঞাপন আর যা যা থাকা দরকার একটা জেলা শহরে তার সবেরই নিদর্শন মিলবে বোলপুরের রাস্তায় – দেওয়াল লিখন, প্রলেপের পর প্রলেপে লাগানো বিভিন্ন flouroscent রঙের কাগজে লাগানো পোস্টার, আর কালিকা সিনেমার ইংরেজিতে লেখা প্রাপ্তবয়স্কদের ছবির পোস্টার "Sex is an integral need"। এরই মধ্যে আপনি যখন অজান্তে ভুবনডাঙ্গার কাছাকাছি পৌঁছে যাবেন – লক্ষ্য করবেন কখন রাস্তার দুপাশে একটা পরিবর্তন ঘটতে শুরু করেছে। বোলপুরের দোকানে যেমন নিত্যপ্রয়োজনীয় জিনিসের ভিড়, ভুবনডাঙ্গার দোকানগুলোর চরিত্র যেন সব একরকম – শান্তিনিকেতনি বাটিক, শান্তিনিকেতনি ব্যাগ, শান্তনিকেতনি চামড়ার ব্যাগ, আর তার সঙ্গে পাওয়া যেতে পারে কিছু অন্য রাজ্যের কুটির শিল্পের নিদর্শন। ঠিক যেমন ভারতবর্ষের আর পাঁচটা ধর্মীয় স্থান যেমন খাজুরাহো, মহাবলীপুরমে পাওয়া যেতে পারে – কোথায় যেন ভারতবর্ষের যে কোন দ্রষ্টব্য স্থানে ঢোকার মুখের গলিতে দোকানের চরিত্র একদম একরকম। আপনার মনে হবে বোধহয় শান্তিনিকেতনের কাছে এসে গেছি। আর হবেও ঠিক তাই, একটা ছোট ব্রীজের মুখেই দেখবেন লেখা "Welcome to Santiniketan"। ঠিক তারপর থেকেই চারপাশের অভিজ্ঞতা একটু বদলে যাবে – বাড়িগুলোর চেহারা আলাদা, গায়ের রঙ আলাদা, রাস্তার দুপাশের চেহারা আলাদা, আর আকাশে শুধু গাছ আর অসংখ্য ইলেকট্রিক, কেবল্ টিভি আর টেলিফোনের তার।

Scanned with CamScanner

বোলপুর থেকে পরিবেশ অনেক শান্ত, মাঝে মাঝে শুধু যানবাহনের কিছু তীব্র হর্ণ। একটু ফাঁকা ফাঁকা, তবে ডানদিকে খেয়াল রাখলে দেখবেন সবই আছে – ক্যান্টিনের গায়ে বিশাল Cocacola-র দেওয়াল চিত্র, রাস্তার লাইট পোস্টে রঙিন কাগজে পোস্টার – তবে এইটুকুই বাঁচোয়া যে জায়গাটি এখনও শিক্ষা প্রতিষ্ঠান। এইভাবে বাঁদিকের প্রথম গেট ছেড়ে দ্বিতীয় গেট দিয়ে আপনি ঢুকে পড়তে পারেন শান্তিনিকেতন আশ্রমের মূল অঙ্গনে। যদিও গেট বেশির ভাগ সময়ে বন্ধ থাকে। বড়ো গেটের পাশের মিনি গেট ধরে আপনি এগিয়ে যেতে পাবেন। প্রথমেই বাঁদিকে "হিন্দীভবন"। শান্তিনিকেতনের সমস্ত শিক্ষাবিভাগের বাড়িগুলো এক একটা 'ভবন', হিন্দীভবন অর্থাৎ হিন্দীভাষা শিক্ষাকেন্দ্র – একেবারে স্নাতকোত্তর পর্যন্ত। গেট পেরিয়েই সামনের ছোট বারান্দার উপরের ফলকে হিন্দীতে লেখা 'হিন্দীভবন'। বারান্দা ধরে সোজা সামনের বড় হলঘরে ঢুকে পড়ুন। ঘরের মেঝেতে সারি সারি বেঞ্চ পাতা। হয়ত ক্লাস চলতেও পারে। যদি ঢোকার অনুমতি পাওয়া যায় দেখা যাবে দেওয়ালের দরজার উপরাংশে, চারদিক ধরে দেওয়াল চিত্র। তিনদিকের দেওয়াল চিত্র মনে হবে একজনের আঁকা, আর একটা দিক আরেকজনের। তিনদিকের যে দেওয়াল চিত্র সেটি হল বিনোদবিহারী মুখার্জী কৃত চিত্র "মধ্যযুগীয় সন্ত"। চিত্রের চতুর্দিকে মানুষের ভিড়, ঘরের ভিতরে মানুষ, রাস্তায় মানুষ, নদীতে মানুষ আর তার মাঝে মাঝে সাধারণের থেকেও বড় আকারের সন্তরা, সাধারণের সঙ্গে কথোপকথনরত চারিদিকে শুধু মানুষের ভিড়। প্রথম দর্শনেই বোলপুরের ভিড়ের কথা মনে হবে। পরক্ষণেই মনে হবে এই ভিড় যেন ভীষণ শান্ত, স্থির, দৃঢ়। অবশ্যই বিনোদবিহারী বোলপুরের ভিড় দেখে এই ছবির বিন্যাসের পরিকল্পনা করেন নি, কারণ দেওয়াল চিত্রটি ১৯৪৬/৪৭ সালে আঁকা, তখন বোলপুর এতটা বিস্তৃত ছিল না, আর শান্তিনিকেতনেও যেটুকু বসতি এখন চোখে পড়ে, তার এক চতুর্থাংশও থাকার কথা নয় – থাকার কথা নয় এখানকার এই চতুর্দিকের জ্যামিতিক পরিকাঠামো। তাই ভাবতে অদ্ভুত লাগে কিসের তাড়নায় বিনোদবিহারী শান্তিনিকেতনের মতো শান্ত, আত্মমগ্ন পরিবেশে এই রকম একটি জমকালো পরিমণ্ডল সৃষ্টি করলেন। আর তার থেকেও বেশি ভাবার পাবলিক স্পেস্-এর অন্দরমহলের সাথে বাইরের সম্পর্কের সংযোগস্থলের চরিত্রটা আসলে কি রকম ?

Scanned with CamScanner

সেখানে শিল্পীর ব্যক্তিগত প্রবণতা এবং একটি স্থানের পারিপার্শ্বিক প্রয়োজনীয়তা – এই দুইয়ের সম্পর্কের মানদণ্ড আসলে কিসের ভিত্তির উপর দাঁড়িয়ে আছে।

যে কোন গুহাচিত্রের ক্ষেত্রে গুহার দেওয়ালে আঁকা ছবির সাথে বাইরের জগতের পরিমণ্ডলের একটা জৈবিক সম্পর্ক থাকলেও থাকতে পারে। তাদের প্রতিদিনের জীবনযাত্রা, যাযাবর জীবন, বাইরের অচেনা প্রকৃতি এ সবকে ভিত্তি করে যে বিশ্বাস গড়ে ওঠে তা প্রতিফলিত হয় গুহার অন্দরে, সে ক্ষেত্রে বাইরের জীবনের সরাসরি অন্তর্ভুক্তি লক্ষ্য করা যায় চিত্রগুলিতে। কিন্তু লক্ষণীয় বিষয় হল যত মানব সভ্যতা তথাকথিত সভ্যতার আলো দেখেছে, যত মানুষের বিশ্বাস বিভিন্ন খণ্ডে দ্বিখণ্ডিত হয়েছে, মানুষের বাইরের জগতের সাথে তার অন্দর সাজানোর রীতির দূরত্ব বেড়েছে। বিশেষ করে সামাজিক (public) স্থাপত্যের ক্ষেত্রে, স্থাপত্যের প্রাসঙ্গিকতাকে মাথায় রেখে অন্দরের ছবি আঁকা হয়েছে। সেক্ষেত্রে পাবলিক স্পেস্-এর চেহারা যত সুনির্দিষ্ট হয়েছে তার ব্যবহারিক চরিত্রও বদলেছে আর সেই সঙ্গে বদলেছে অন্দরমহলের চিত্রণের রীতি।

শিল্প বিপ্লব পূর্ব অবস্থায় "public interier" বলতে দুটি জায়গাকেই বোঝাত। এক রাজার দরবার আর না হলে মন্দির / বা গীর্জায় উপাসনা অঙ্গন। সব সময়ে শিল্পী যখন এই সমস্ত জায়গার চিত্রকল্প করছেন তার সামনে দুটি প্রসঙ্গ ছিল পৃষ্ঠপোষকতা এবং বিশ্বাস। শিল্প বিপ্লবের পরে পাবলিক স্পেস্ বলতে অনেকগুলো স্বনির্ভর জায়গার আবির্ভাব ঘটে – বিনোদন ক্ষেত্র, সাধারণের মেলামেশার জায়গা এবং যাদুঘর। পাবলিক স্পেস-এর বিবিধতার সঙ্গে শিল্পীর ভূমিকাও বদলে যায়। শিল্পী আগের থেকে অনেক বেশি অন্তর্মুখী এবং আত্মবিশ্লেষণমুখী এক প্রয়োগ পদ্ধতিতে একাগ্র হয়ে পড়ে। মূলস্রোতের শিল্পধারা আলাদা করে পাবলিক স্পেস্ নিয়ে খুব একটা মাথা ঘামায় না। সেক্ষেত্রে ১৮শ শতক থেকে বিংশ শতাব্দীর মাঝামাঝি পর্যন্ত আলাদা করে পাবলিক স্পেস্ শিল্পের বিচরণ স্থান হিসাবে খুব একটা উৎসাহ তৈরি করেনি শিল্প মহলে। যদিও আধুনিকবাদীদের চিরকালীন agenda ছিল পরিবর্তনশীল মানবজীবনে সঙ্গী হয়ে ওঠা, আধুনিক শিল্প প্রক্রিয়া মূলত ব্যক্তির শিল্পভাষা চর্চার বিন্যাসেই সীমিত ছিল। দেওয়ালচিত্র শিল্প বিপ্লবের

Scanned with CamScanner

আগে সামাজিক জীবনে যে ধরনের গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা নিয়েছিল, নব্যযুগের মেক্সিকান দেওয়ালচিত্র শিল্পীরা ছাড়া, আধুনিকযুগে দেওয়ালচিত্রের সেভাবে কোন সামাজিক প্রয়োগ লক্ষ্য করা যায় না।

মেক্সিকান দেওয়ালচিত্রের একটা রাজনৈতিক এবং সামাজিক প্রেক্ষাপট থাকার ফলে বিষয়গতভাবে দেওয়ালচিত্র গুলির মধ্যে একটা অখণ্ডতা লক্ষ করা যায়। স্থাপত্যের ব্যবহারিক প্রক্রিয়াকে মাথায় রেখে যে সবসময় চিত্রগুলি আঁকা হয়েছে তা নয়, আবার অনেক সময় হয়েছেও, যেমন গীর্জার ভিতরে আঁকা চিত্র। অর্থাৎ এক ধরনের সেকুলার মন ও ব্যক্তিত্বকে গুরুত্ব দেওয়া হয়েছে। ইটালিয় রেনেসাঁসে দেওয়াল চিত্রগুলি গীর্জার ভিতরেই আঁকা ফলে শিল্পীর বিশ্বাসের ক্ষেত্রে একধরনের জায়গা ও বিষয়ের একটা যোগাযোগ লক্ষ্যনীয় যদিও শিল্পী অনেক সময়েই এই বিশ্বাসকে পুনর্মূল্যায়ণ করেছেন, প্রশ্ন করেছেন। ফলে মানবিককরণের যে চরিত্র পাওয়া যায় তার মধ্যে ধর্মের একটা অবস্থান আছে। স্থাপত্যের যে সামাজিক এবং মানসিক গুরুত্ব জনসামাজিক তলে তৈরি হয় তাকে অনেকটাই মর্যাদা দিয়ে এই দেওয়ালচিত্র গুলো তৈরি, ফলে এই সমস্ত চিত্র সামাজিক জীবনের অনেকটা মূল স্রোতে প্রবেশ করতে সক্ষম হয়েছিল।

শিল্পবিপ্লবোত্তর যুগের সবচেয়ে বড় চাহিদা ছিল শিল্প কিভাবে নতুন সামাজিক জীবনের অংশ হয়ে উঠবে। বিপ্লবের সাপেক্ষে একটা সংগঠিত আদর্শকে সামনে রেখে মেক্সিকান দেওয়াল চিত্রগুলি একধরনের ধর্মনিরপেক্ষ হস্তক্ষেপে সফল হয়েছিল, যা মেক্সিকান মনের সামাজিক প্রেক্ষাপটকে নির্দেশ করতে পেরেছিল। কিন্তু অনেক সময়ই স্থাপত্যের ব্যবহারিক প্রক্রিয়ার অংশ করতে পারেনি। এই সূত্রে বিনোদবিহারীর হিন্দীভবনের দেওয়াল চিত্র নিয়ে ভাবতে গেলে দেখা যাবে হিন্দু সন্ত একটি সম্পূর্ণভাবে জায়গাভিত্তিক চিত্রপ্রক্রিয়া যা স্থাপত্যের আচারের সাথে, ব্যবহারিক প্রক্রিয়ার সাথে ধর্মনিরপেক্ষ প্রক্রিয়ার সংযোগ স্থাপন করতে সক্ষম হয়েছিল। যেমন একদিকে উনি ভক্তি ভাবধারার পথিকৃত এবং বিশেষভাবে হিন্দু মানবধর্মী ভাবধারার পথিকৃতদের স্মৃতি সংরক্ষণ করছেন পাশাপাশি স্থাপত্যের ব্যবহারিক প্রক্রিয়াতেও চিত্রের সংযোগ স্থাপন করেছেন —হিন্দি ভাষা শিক্ষা কেন্দ্রে একদিকে স্মৃতির বিনির্মাণ করছেন পাশাপাশি দেওয়াল চিত্রকে, আধুনিক, ধর্মনিরপেক্ষ প্রক্রিয়া

Scanned with CamScanner

হিসাবে পরিবেশন করছেন।

চলুন আবার বেরিয়ে পড়া যাক। আমরা এবার হিন্দীভবনের ঠিক পাশের বাড়িটির দিকে এগোব। এটি চীনভবন। দোতলা বাড়ি। পিছনে ডানদিকে, বাঁদিকে বাড়িটি ছড়ানো। বাড়ির সামনের অংশে সমস্ত বাড়িটি জুড়ে বারান্দা তাতে রেলিং এবং ছোট ছোট থাম লাগানো। ফলে বারান্দাগুলো ছোট খোপের আকার নিয়েছে। একই রকম বারান্দা দোতলাতেও। দীর্ঘ সরু বারান্দা পেরোলেই একদম সামনের বড় ঘর, ঘরে ঢুকেই বিপরীত দেওয়ালে বিশাল একটি দেওয়ালচিত্র, মাসোজীর আঁকা অজন্তার অনুকরণ গোটা দেওয়াল জুড়ে দাঁড়িয়ে আছে। বারান্দায় উপরে সারি সারি প্যানেল জুড়ে নন্দলাল বসুর ইটালিয় দেওয়াল চিত্র পদ্ধতিতে তৈরি রবীন্দ্রনাথের নটির পূজা। বারান্দা ধরে ডান দিকে এগোলে বাঁ হাতে হলঘর ছেড়ে, সোজা একটি দরজা পাওয়া যাবে। উপরে উঠে পড়ুন। ছোট ছোট সিঁড়ি পেরিয়ে দুতলার কাছাকাছি পৌঁছে গেলেই, দোতলার মাঝ বরাবর থেকে দোতলায় ওঠার ডানদিকের দেওয়ালে আস্তে আস্তে চোখে পড়বে বিনোদবিহারী মুখার্জীর চীনভবনের দেওয়াল চিত্র (১৯৪২)। চিত্রের বিষয় চীনভবনের কক্ষবিন্যাস, তাতে ঘটে চলা বিভিন্ন ঘটনা– পাশের হস্টেলের চিত্র, সেখান থেকে ক্লাস রুমে ঢুকে পড়া-অধ্যয়নরত ছাত্রছাত্রীরা। হঠাৎ আপনার সময় বিবেচনা ঠিক হলে মনে হবে ছেলেমেয়েরা যেন ছবিতে হেসে খেলে উঠল। অনেক ছাত্রছাত্রীর কথা বলার আওয়াজও আপনি শুনতে পাবেন। যেন দেওয়াল কথা বলে উঠছে। আসলে একটু খেয়াল করলে আপনি বুঝতে পারবেন, নিচের হলঘরের ক্লাস ভেঙেছে, ছাত্রছাত্রীরা বারান্দায় বেরিয়ে পড়েছে। তারই আওয়াজ কোথায় মিলেমিশে গেছে চীনভবনের এই দেওয়াল চিত্রটির চিত্রবিন্যাসের সাথে। এরপর আপনি যদি আস্তে আস্তে চিত্রটির ঠিক পাশের রাস্তা ধরে এগুতে থাকেন, একসময় আপনি খেয়াল করবেন, দেওয়ালের ছবিগুলো আর দেখা যাচ্ছে না। এক বিশেষ কৌণিক পরিস্থিতির ফলে দক্ষিণ দিক থেকে আসা সূর্যালোকের প্রতিফলনে শুধু দেওয়াল ছাড়া আর কিছু দেখা যায় না। সূর্যের আলোর সাপেক্ষে একটা বিশেষ দূরত্ব থেকেই দেখতে হবে। আপনি আরেকটি বিষয়ও লক্ষ্য করতে পারেন যে যদিও দেওয়ালের চিত্র বিন্যাস তিনটি

দেওয়ালকে নিয়ে এবং সাধারণভাবেই পুরো চিত্রটিকে একসঙ্গে লক্ষ করা সম্ভব নয়. কোথাও শিল্পী খুব সচেতনভাবে আপনার যাত্রাপথের সঙ্গী করে নিয়েছেন চিত্রের বিন্যাস। কখনো আপনার অলক্ষ্যে আপনার পায়ে হাঁটার জমি এবং চিত্রের তল মিলে মিশে একাকার হয়ে গেছে। দর্শকাসন ঠিক দর্শক হিসেবে যেন আর আলাদা করা নেই, আপনি যেন চিত্রবিন্যাসের তলের সঙ্গী। যেমনটি ঘটে একটি সামাজিক আচারের (ritual) ক্ষেত্রে।

যেকোন আচারে দর্শক শব্দটার সেভাবে কোন অস্তিত্ব থাকে না, কারণ, আচারের (ritual) মূল ভাবধারা (concept) কোন না কোন ভাবে সাধারণ মানুষের মনবলয়ের সঙ্গে যুক্ত থাকে। অর্থাৎ একটা পরিচালিত পরিবেশনায় আলাদা করে যোগাযোগ শব্দটাকে গুরুত্ব দিতে হয় এবং পরিবেশনার পর্যায়গুলোকে সাজাতে হয় এমনভাবে যাতে সমস্ত পর্যায়গুলো একটা বিষয়কে প্রতিফলিত করে, তা সে কোনো performance হোক বা চিত্রকলা বা অন্য যে কোন মাধ্যমের শিল্পচর্চা হোক। কিন্তু আচারের (ritual) ক্ষেত্রে এই সাজানোর প্রক্রিয়াটা শুধু একটা বিশেষ সময় ভিত্তিক প্রক্রিয়ার মধ্যে সীমিত নয়, সেখানে একটা বৃহত্তর প্রক্রিয়া ঘটে। আসলে বিভিন্ন আচার অনুষ্ঠানের (ritual) পুনরাবৃত্তি প্রক্রিয়া একটা সময় তার কাঠামোগত বৈশিষ্ট্যের বাইরে নিয়ে যেতে সাহায্য করে। সেখানে দর্শকের মনে প্রকরণশৈলীর দক্ষতার থেকে আচারের (ritual) প্রক্রিয়াটাই গুরুত্বপূর্ণ হয়ে ওঠে অর্থাৎ কিভাবে সাধারণের মনবলয়ে পৌঁছনো যায়, কিভাবে দেখার প্রক্রিয়াকে বিশ্লেষণের বাইরে নিয়ে গিয়ে একটা বোধের স্তরে পৌঁছে দেওয়া যায়, যেখানে প্রক্রিয়ার অভিজ্ঞতাই একমাত্র অস্তিত্ব আর সেটা তখনই সম্ভব যখন দেখার প্রক্রিয়ার বারংবার পুনরাবৃত্তি ঘটানো যাবে। একটি ছবির ক্ষেত্রের ব্যক্তিগত পর্যায়ে হয়ত ক্রমাগত ছবিটিকে দেখার মধ্যে দিয়ে ছবিটি একজন ব্যক্তির মনবলয়ে অনুপ্রবেশ করতে পারে, সমষ্টিগত স্তরে একটি সার্থক দেওয়ালচিত্রের সেই ক্ষমতা আছে। কিন্তু সেটা তখনই সম্ভব যখন দেওয়ালচিত্রের চিত্রবিন্যাস, চিত্রভাবনা স্থাপত্যের ব্যবহারিক পরিকাঠামো এবং প্রয়োজনীয়তার সঙ্গে ওতপ্রোতভাবে জড়িত। অতীতে ভারতীয় মন্দির স্থাপত্যে এই দৃষ্টান্ত ভীষণভাবেই লক্ষণীয়। দক্ষিণী মন্দির

Scanned with CamScanner

স্থাপত্য, তার ভিতরের গর্ভগৃহে যাত্রাপথ, যাত্রাপথের চারধারের ভাস্কর্য, ছাদের দেওয়াল চিত্র সমস্ত রকমের অঙ্গশয্যা, দর্শনার্থীকে মানসিক ভাবে সাহায্য করে এক চরম অভিজ্ঞতার সম্মুখীন হতে, এবং তা সফল হয়। ধর্মীয় মতাদর্শের প্রচারের পুনরাবৃত্তি ঘটিয়ে ধারণাগত এবং মানসিক প্রস্তুতি তৈরি করা হয়। এই প্রক্রিয়া যে কোনো ধর্মীয় গোষ্ঠী করে থাকে। আধুনিক সময়ে দৈনন্দিন প্রকরণের প্রস্তুতির পরিকাঠামো পরিবর্তনের সাথে সাথে মানুষের মানসিক প্রক্রিয়া বিভিন্ন পর্যায়ে বিভক্ত এবং বিচ্ছিন্ন, ফলে ধর্মের বাইরে গিয়ে এই পরিবর্তনগুলোকে সরাসরি নির্দেশ করা, মানুষের দৈনন্দিন আচারের (ritual) সঙ্গে তার সংযুক্তি ঘটানো সবচেয়ে কঠিন এবং চ্যালেঞ্জিং প্রক্রিয়া।

আধুনিক শিল্পীরা ভেবেছিলেন যে কেবলমাত্র বস্তুগত পরিবর্তনের মধ্য দিয়ে কোথাও সাধারণ মানুষের মানসিক পরিবর্তনকে নির্দেশ করা যেতে পারে। কিন্তু কৃষিভিত্তিক সমাজ থেকে যন্ত্র নির্ভর সমাজের আচার প্রক্রিয়ায় প্রবেশ করতে গেলে শুধু শিল্পের বস্তুগত পরিবর্তনই যথেষ্ট নয়, তার সাথে সাথে সামগ্রিক সামাজিক মনবলয়ে প্রবেশের প্রক্রিয়াকে নির্ধারণ করতে হবে। এইখানেই আধুনিক শিল্পচর্চা এবং প্রাচীন শিল্প চর্চার পরিকাঠামোগত একটা পার্থক্য তৈরি হয়েছে। প্রাচীন শিল্পের কাছে শিল্পভাবনা যে সমাজকে নিয়ে তার ভাবধারা, সামাজিক পরিকাঠামোর মধ্যেকার যে বিন্যাস তা একমুখী অর্থাৎ কৃষিভিত্তিক। মানুষের সঙ্গে মানুষের যোগাযোগের মূল আধার প্রকৃতি, এবং তার থেকে উদ্ভূত ধর্মীয় ভাবনা। আধুনিক সময়ের মানুষের প্রকৃতির সঙ্গে যোগাযোগের প্রক্রিয়া বিচ্ছিন্ন, ফলে যোগসূত্রকে নতুনভাবে নির্ধারণ করা প্রয়োজন, ধর্মীয় যোগ যথেষ্ট নয়। যদিও বহু ধর্মীয় প্রতিষ্ঠান আধুনিক সময়ের পরিকাঠামোগুলোকে ধর্মভাবে উদ্বুদ্ধ করতে উদ্যত, কিন্তু শিল্পীর অবস্থানকে সময়োপযোগী করতে নব্য আচারের (ritual) পরিকাঠামো তৈরি হওয়া বাঞ্ছনীয়।

চলুন আমরা আবার একটু শান্তিনিকেতনের রাস্তায় হাঁটি। বিনোদবিহারীর আরেকটি দেওয়ালচিত্র (mural) দেখা যাক। চীনভবনের বাড়ি ছাড়িয়ে সোজা নাক বরাবর হেঁটে পৌঁছে যাবেন আশ্রম মাঠ। এই মুহূর্তে আশ্রম শব্দটা খুব

আশ্চর্যকর লাগতে পারে যাঁরা প্রথমবার শান্তিনিকেতনে আসছেন তাদের জন্য। আশ্রম কোন দিকটায় ? আশ্রম মাঠে কোন বাবাজীর আশ্রম ? আবার যারা একটু আগে থাকতে খবর নিয়ে এসেছেন তাদের কাছে আশ্রম শব্দটা ঠিক ধর্মীয় মানে বহন করবে না। আশ্রম অর্থাৎ শিক্ষাশ্রম, প্রাচীনকালের তপোবন শিক্ষার আদলে, প্রকৃতির কোলে খোলা মনে ছাত্রছাত্রীরা জ্ঞান আহরণ করবে এবং তার চর্চা করবে, এই ছিল কবিগুরু রবীন্দ্রনাথের আশ্রমশিক্ষার পরিকল্পনা। খুব অদ্ভুত লাগে ভাবতে যে ১৯২০ সালে যখন সারা পৃথিবী যন্ত্র পরিকল্পিত নতুনযুগের, নতুন হাওয়াকে আহরণে উদ্যত, রবীন্দ্রনাথ, প্রকৃতিমুখী একটি শিক্ষাচর্চা স্থাপনে কর্মতৎপর এবং শুধু শিক্ষাশ্রমই নয়, তার সঙ্গে পাশাপাশি এমন কিছু প্রক্রিয়াকে শুরু করছেন যেগুলির পুনরাবৃত্তির মধ্যে দিয়ে আশ্রমের সামাজিক জীবনকে বাঁধবার চেষ্টা করছেন। বসন্ত উৎসব, বর্ষামঙ্গল, বৃক্ষরোপণ, হলকর্ষণ প্রভৃতি বার্ষিক প্রক্রিয়ার মধ্যে দিয়ে বিভিন্ন শিল্পমাধ্যমের সাথে সমাজের যোগাযোগ স্থাপনের প্রয়াস চলছে। শুধু তাই নয়, শিল্পচর্চার অস্তিত্বকে একটা সামাজিক অস্তিত্বে পরিবর্তিত করছেন। রবীন্দ্রনাথ শান্তিনিকেতনের সাপেক্ষে কতগুলি ধর্মনিরপেক্ষ আচারের প্রয়োগ করছেন। আবার পাশাপাশি ভাবতে অদ্ভুত লাগে সেই একই প্রতিষ্ঠানে সময়ের সাথে সাথে সেই ছোট ছোট আচারগুলি এক বৃহত্তর অনুষ্ঠানে পরিবর্তিত হয়ে, দ্রষ্টব্য বস্তুতে পরিণত হয়ে একটা প্রাতিষ্ঠানিক প্রক্রিয়ায় সীমিত হয়ে যায়। তবু ভাবতে ভাল লাগে যে শান্তিনিকেতনের এই প্রাতিষ্ঠানিকতার মধ্যেও তার স্বতন্ত্রতা উদ্বুদ্ধ করে শান্তিনিকেতনে প্রথমবার ঘুরতে আসা কোন নামহীন টুরিস্টকে। আধুনিক সময়ে শিল্পের সবচেয়ে বড় প্রতিকূলতা বোধহয় মিউজিয়াম বস্তু হয়ে যাওয়া, সবচেয়ে কঠিন পরীক্ষা, মানুষের মনবলয়ে টিকে থাকা।

কোণাকুণি উত্তর দক্ষিণ কোন বরাবর সোজা হেঁটে গেলেই কলাভবন। একটু এগোলে বাঁদিকে ইউক্যালিপটাসের বিশাল গাছের ফাঁকে রামকিঙ্কর বেইজের ভাস্কর্য, ছোট সুজাতা, শুনেছি আগে সুজাতাই বড় ছিল ক্রমে গাছের আকার বৃদ্ধি হওয়ার সাথে সাথে সুজাতার আকার ছোট হয়েছে। একটু এগোলে ডানদিকে কংক্রিটের দেওয়ালের পাশে কংক্রিটের বুদ্ধ। আগে পাশে ছাত্রী আবাস ছিল না, তাই বুদ্ধের চারপাশে খোলা জায়গা ছিল, সুজাতার সাথে এই ভাস্কর্যের যোগাযোগও

Scanned with CamScanner

ছিল। এখন ছাত্রীবাস থেকে আলাদা করতে বড় প্রাচীর বুদ্ধের বাঁদিকে, ডানদিকের পাঁচিল যদিও ইদানীং ভেঙে ফেলা হয়েছে, ফলে এখন বুদ্ধকে যেমন অনেক কাছ থেকে দেখা যায় আবার বুদ্ধের কোলে বসে আপনি ছবিও তুলতে পারেন – খবরদার একথা ঘুনাক্ষরেও ভাববেন না, শিল্পবস্তুকে ছুঁতে নেই। একটু এগুলেই কালো বাড়ি, মাটির তৈরি, আলকাতরায় রাঙানো কালো বাড়ি। গায়ে ভারতীয় এবং মিশরিয় শিল্পকলা (relief) – নন্দলাল বোস, রামকিঙ্কর বেইজ এবং ছাত্রছাত্রীদের একত্রে তৈরি করা, আগে স্টুডিও ছিল। এখন স্নাতকশ্রেণীর শেষ বর্ষের ছাত্রদের বাসস্থান। আবার রাস্তায় ফিরে আসুন একটু এগোলেই ডানদিকে কলাভবন। প্রথমেই ডানদিকে রাস্তার গা ধরে কলাভবনের দিকে মুখ করে হেঁটে চলেছেন গান্ধী। এই রাস্তাটা পেরিয়ে আরেকটু এগোলে বাঁদিকে আমতলা পেরিয়ে একটু দূরে কলাভবনের আমতলা হস্টেল। রাস্তার ডানদিকে আবার কলাভবনে ঢোকার মোরাম লাগানো আরেকটি রাস্তা। এই রাস্তা ধরে একটু এগোলেই লোহার রেলিং দেওয়া, নুড়ি পাতা একটা বর্গক্ষেত্রে। চিত্রকলা বিভাগের ঘরের গা ঘেঁসে সেই বর্গক্ষেত্র বরাবর যে দেওয়াল গেছে তাতে বিনোদবিহারীর কলাভবনের সর্বশেষ এবং একমাত্র বাইরে তৈরি দেওয়ালচিত্র (১৯৭২)। ইঁটচুনার প্রলেপ লাগানো জমিতে ছায়া ছায়া মানুষের আকৃতি, টাইলস দিয়ে বানানো। মানুষের ভিড়, কারো মাথায় বোঝা, কারো বাঁ কাঁধে বাঁক, সবাই হাঁটছে ...... । দেওয়ালচিত্রটির জমির কোনো বিশ্লেষণ নেই। পুরোটাই একটা তল, সবাই তাতে হাঁটছে। বাইরে লোহার কাঠামো থাকায়, পুরো ভিত্তিচিত্রটিকে মনে হয় যেন ফ্রেমে বাঁধা। শোনা যায় শুরুতে কোন রেলিং ছিল না। মনে করুন শুধু ৬০ফুটের লম্বা লাল দেওয়াল তাতে মানুষ হাঁটছে আর আপনি সেই দেওয়ালের লাগোয়া রাস্তা ধরে হাঁটছেন। আপনি হাঁটছেন, দেওয়ালের রাস্তা জুড়ে আরো মানুষ হাঁটছে। এখন লোহার রেলিং, মাঝখানে নুড়ি পাথর আপনি শুধু দূর থেকে দেখছেন – কিভাবে আমাদের শিল্প সংরক্ষণ সচেতনতা কোনো শিল্প প্রক্রিয়ায় অংশগ্রহণের পদ্ধতিকে কেবলমাত্র পট দেখার প্রক্রিয়াতে পরিণত করে, কেবলই একটি সুষ্ঠ সংরক্ষিত চিত্র। মাঝে মাঝে প্রশ্ন জাগে, আসলে শিল্পের সার্থকতা কিসের উপর নির্ভরশীল, তার সময়ের সাপেক্ষে বেঁচে থাকায়, না সময়ের সাথে বেঁচে থাকায় ? বিনোদবিহারী মনে করতেন, "শিল্পী

Scanned with CamScanner

যা সৃষ্টি করে তা চিরস্থায়ী নয়।"

কলাভবনে যে অংশে (অর্থাৎ mural studio) বিনোদবিহারীর শেষ দেওয়াল চিত্রটি লাগানো আছে তার ঠিক বিপরীত মুখেই কলাভবনের আমতলা ছাত্রাবাস। তারই উত্তর দক্ষিণ কোণে কলাভবনের সবচেয়ে প্রথম ঘরটি। এখন অবশ্য অন্যান্য নব্য ছাত্রাবাসগুলির ভিড়ে তার সে স্বীকৃতি স্মৃতি হয়ে আছে। সেই ছাত্রাবাসটির ছোট্ট বারান্দার সিঁড়ির সামনে গেলেই চোখে পড়বে বারান্দার ছাদে বহু রঙে আঁকা নিসর্গচিত্র (১৯৪০)। বারান্দার লোহার গেট খুলে ঢুকলেই প্রথমে নজর কাড়বে মাঝখানের চৌকো জলাশয়, তাতে কালো মোষের দল গা ধুতে নেমেছে। মোষেদের সঙ্গে ঘুরতে ঘুরতে আপনি অনায়াসেই পৌঁছে যাবেন পাশের গাছগুলিতে। গাছের আড়ালে কোথাও কাঠবেড়ালি, কোথাও টিয়া বা মুখপোড়া হনুমান। এই ভাবে সারি সারি গাছের ডাল বেয়ে বেয়ে কখন যে আপনি গোটা ছাদটা একবার ঘুরে দেখে নিয়েছেন আপনার খেয়ালই হবে না। তারপর যদি ঘাড় উঁচু করে দেখতে দেখতে ঘাড়ে ব্যাথা হয় মেঝেতে শুয়ে পড়ুন এক মুহূর্তে, আপনি এতক্ষণ ছাদের যে অংশগুলো অংশভাগে দেখছিলেন সব একসঙ্গে এসে হাজির। পুরো জমিটাই এবার বেশ এক সাথে দেখা যাবে।

শিল্পে ব্যক্তির অবস্থান অবশ্যম্ভাবী, কিন্তু শিল্পের সার্থকতা তখনই সিদ্ধ হয় যখন ব্যক্তির পরিকাঠামোর বাইরে গিয়ে শিল্প তার স্বমহিমায় দর্শককে দর্শকাসনের গণ্ডির বাইরে নিয়ে যাবে দর্শক আর নিজেকে বহিরাগত ভাববে না, শিল্পের অন্তর্গত হয়ে যাবে বা উল্টোটা – শিল্প দর্শকাসনের অন্তর্গত হয়ে উঠবে।

১৯৭০ এর পর থেকে ইউরোপে বিশেষ করে ইংল্যাণ্ডে এবং আমেরিকায়, শিল্প প্রক্রিয়াকে পাবলিক স্পেস্-এর অন্তর্গত করার প্রয়াস হয়েছে, যেখানে শিল্পীর ভূমিকা অনেকটা সূত্রধরের মতো, বা নাটকের কর্ণধারের মতো। শিল্পের মাধ্যমকে প্রতিদিনের সামাজিক প্রক্রিয়াগুলির সঙ্গে সংযুক্ত করে শিল্পকে মানুষের দৈনন্দিন প্রক্রিয়ার সঙ্গী করার প্রয়াস চলছে। কিছু সাময়িক সাফল্য তাতে মিলেছে কিন্তু এই সাময়িক প্রয়াসের প্রতিফলন হয় পাবলিক স্পেস্-এর কিছু শিল্প নিদর্শনে সীমিত থেকে গেছে আর না হলে এই পদ্ধতি গুলি এমনি এককালীন প্রক্রিয়া

Scanned with CamScanner

হিসাবে থেকে গেছে যে সেই প্রয়াসের অভিজ্ঞতা এক ধরনের সাময়িক প্রতিক্রিয়া সৃষ্টি করেই ক্ষান্ত থেকেছে।

যে কোন ritual সেই দিক থেকে সাময়িক হলেও, তার পুনরাবৃত্তির ফলে একটা সামগ্রিক মনস্তত্ত্বের মধ্যে তার অস্তিত্বকে বজায় রাখতে সফল হয়, যার ফলে একটা ঘটনা একটা জীবন চর্চায় পরিণত হয়। এই ধরনের একটি প্রয়াস ১৯৯৩ সালের Sculptor Chicago তে Street Level Vedio Block Party নামে একটি Culture in Action project এ লক্ষণীয়। শিল্পী ইনিগো মানগ্লাও। ওভালে, তার অধুসিত ওয়েস্ট টাউন অঞ্চলের রাস্তার জীবনকে পরিবর্তন এবং শোধরানোর প্রয়াস চালান। এই অঞ্চলের মূল বাসিন্দারা ভীষণভাবে গ্যাং, ড্রাগ, বেকারি ও অন্যান্য অসামাজিক কাজকর্মে লিপ্ত। ইনিগো vedio camera কে মাধ্যম হিসাবে ব্যবহার করেন এবং লোকাল মস্তানদের নেতাদের তার শিল্প প্রক্রিয়ার সঙ্গী করে নেন এবং (SLV) Street Level Vedio র সূত্রপাত হয়। এই মস্তান নেতাদের হাতে camera দেওয়া হয় এবং এরা নিজেরাই নিজেদের গল্প সংগ্রহ করতে থাকে। ফলে শিল্প প্রক্রিয়ায় ভিতর বাইরের বিভাজন থাকে না। একে অপরের শ্রোতা হয়ে ওঠে। এমনকি যখন এই project শেষ হয় SLV বন্ধ হয়ে যায় নি। এখনও তা Street Level Youth Media হিসাবে ক্রমবর্ধমান। ব্যক্তি এবং সমাজের মধ্যে যোগসাযোগ তৈরির এই প্রয়াস হয়ত চিরকালীন তবু বার বার শিল্পের ভূমিকার পূনর্বিন্যাস হতেই হবে এবং নতুন নতুন প্রয়াসের উদ্ভাবন হবে যাতে শিল্প প্রক্রিয়া ব্যক্তি প্রক্রিয়ার বাইরে গিয়ে একটি সামাজিক প্রক্রিয়ায় পরিণত হয়।

তবে আসুন আমরা একসাথে মাদুর পেতে শুয়ে আমতলা ছাত্রাবাসে বিনোদবিহারী মুখার্জীর ছাদের mural টি উপভোগ করি।

স্মৃতি-বিস্মৃতি ও সত্যজিৎ রায়

শিবাজী বন্দ্যোপাধ্যায়

প্রাককথন

ছড়া কাব্যগ্রন্থের ভূমিকা-কবিতার কয়েকটি ছত্র :

একটুখানি দীপের আলো
শিখা যখন কাঁপায়
চারদিকে তার হঠাৎ এসে
কথার ফড়িং ঝাঁপায়। . . .
আছে ওরা এই তো জানি
বাকিটা সব আঁধার . . . .
চলছে খেলা একের সঙ্গে
আরেকটাকে বাঁধার। . . .
বাঁধনটাকেই অর্থ বলি,
বাঁধন ছিঁড়লে তারা
কেবল পাগল বস্তুর দল
শূন্যেতে দিকহারা।

৬৫ বছর ধরে অনবরত লেখালেখির পর, জীবনের উপান্তে, রবীন্দ্রনাথ পেলেন তাহলে 'অর্থ' শব্দের মানে : 'অর্থ' আর কী – বন্ধনই যে তাৎপর্য, এই বোধ কেবল ; এক শব্দের সঙ্গে আরেক শব্দের গ্রন্থিসাধকতাই অর্থসাধনা। বিক্ষিপ্ত, অসংলগ্ন সব শব্দে 'থাকে' যা, তা স্রেফ 'অভিধা' – অর্থকোষে 'অভিধা'ই মেলে, মেলে না 'অর্থ'। কথার পিঠে কথায়, এর তার জড়াজড়িতেই উৎপন্ন হয় 'মানে'- - বুননই সার, নকশার টেক্সচার বই আর কোথাও বসতি নেই অর্থের। ভাষণ যদি 'বদ্ধ' না হয়, আনতাবড়ি, এলোমেলো হবেই বকুনি — নিষ্ফল সে বাক-কণ্ডুয়ন, অনর্থক আগড়ুম বাগড়ুম।

তবে কিনা, আত্মখণ্ডনে সহজসিদ্ধ রবীন্দ্রনাথ। ছড়া-র ভূমিকা-কবিতায় বেহঁশ

Scanned with CamScanner

ভুল বকার বিপদ সম্বন্ধে হুঁশিয়ারি জারি করেছিলেন তিনি ৫ জানুয়ারি ১৯৪১। আর তার মাস তিন আগে, ১৯৪০-এর ২৪ সেপ্টেম্বর, নির্দ্বিধায় পরোয়াহীন, সেই রবীন্দ্রনাথই লিখেছিলেন জন্মদিনে-র ২০ সংখ্যক কবিতায় :

মনে ভাবিতেছি, যেন অসংখ্য ভাষার শব্দরাজি
ছাড়া পেল আজি,
দীর্ঘকাল ব্যাকরণদুর্গে বন্দী রহি
অকস্মাৎ হয়েছে বিদ্রোহী।

'দুর্গ'-'বন্দী'-'বিদ্রোহ'-এর সূত্রে প্রায় অবধারিত, অদম্যই ছিল একরকম যুদ্ধের নাট্যছবি। 'কুচকাওয়াজের পদক্ষেপ', 'বল্গাবদ্ধ শব্দ-অশ্ব', 'ব্যূহে বাঁধি শব্দ-অক্ষৌহিনী' ইত্যাদি বাকবন্ধে ভরতি কবিতাটিতে দেখি, ছিন্ন ছিন্ন শব্দগুলোই মারমুখো ; খেপে উঠেছে তারা, ছিটকে যাচ্ছে, ছড়িয়ে পড়ছে, ধেয়ে যাচ্ছে শত্রু অভিমুখে ; 'বন্ধন' জিনিসটাই তাদের চাঁদমারি, আক্রমণের লক্ষ্য :

অবিরাম সারি সারি কুচকাওয়াজের পদক্ষেপে
উঠেছে অধীর হয়ে খেপে . . .
মনে মনে দেখিতেছি, সারা বেলা ধরি
দলে দলে শব্দ ছোটে অর্থ ছিন্ন করি . . .
আকাশে আকাশে যেন বাজে
আগডুম বাগডুম ঘোড়া সাজে।

ছড়া-র 'ভূমিকা'য় শুনলাম আমরা, 'বন্ধন'-প্রসূত অর্থে'র বন্দনা ; জন্মদিনে-২০তে, অনর্থের জয়গান। একদিকে, 'বাঁধন' ও 'অর্থে'র সাম্য-সমীপতা ; অপরদিকে, অর্থভেদী শব্দের নৃত্যনৈরাজ্য। একদিকে, খেলার নিয়ম বা 'রুলস্ ওফ দ্য গেম' রক্ষা করার ব্যাকরণ-মনস্কতা ; অপরদিকে, ব্যাকরণের কানুনবিধি উপেক্ষা করার স্পর্ধিত খেলোয়াড়ি। স্পষ্টতই, এরা পরস্পরবিরোধী। আর সে পরস্পর-বিরোধের ভর 'বন্ধন'।

থাকতেই পারে এমন অচলায়তন, এমন তাসের দেশের ভুল স্বর্গ, যেখানে, 'একের সঙ্গে আরেকটাকে বাঁধার' কায়দা নির্ভুলভাবে নির্ধারিত — ছন্দ আছে

Scanned with CamScanner

সেখানে, আছে অঙ্ক-শাসিত দমশ্বাস, আছে সৌসাম্য, প্রীতি, সদ্ভাব, আছে সমন্বয়, নেই শুধু আকস্মিকতার অশান্তি। নেই সুতরাং, ব্যক্তিক উদভ্রান্তির অবকাশ, অন্বয়-নিগড় থেকে পিছলে বেরোনোর বেগ-আবেগ। শান্তির নীড়-নিকেতনেও খেলা জমে বটে, তবে তা মূলত 'পুনর্-মুখী' : ইতো-প্রস্তুত ছকের সুচারু পুনর্মুদ্রণ, ব্যাকরণ-সম্মত মুদ্রা-বিভঙ্গের দক্ষ পুনঃপরিবেশনেই ইতি তার। ঝোঁকটা সেখানে পুনর্বৃতি, রেপিটিশন্-এর ওপর, সরণ বা ডিস্প্লেস্মেন্ট-এর ওপর নয়। ওই ঝোঁক সর্বগ্রাসী হলে তো কথাই নেই। এমন গেড়ে বসে তখন সংস্কার যে যাবতীয় আচারই হয়ে ওঠে প্রচল বা রিচুয়াল-মাফিক। হয়তো-বা যে কোনো দমবন্ধকর,কণ্ঠরোধকর তানাশাহীর, টোটালিটারিয়ান রাজ-রাষ্ট্রের সামান্যচরিত্রই এই।

আঁট-জমাট রাজকে আবার স্বর্গরাজ্য হিসেবেও রঞ্জিত-চিত্রিত করা যায়। বলা যায়, এই তো সেই 'সব পেয়েছির দেশ' – কোনো অসম্পূর্ণতা নেই, অ-ভাব নেই এখানে, নেই অতএব মর্মপীড়ার কারণও। 'অ-ভাব' বা 'ওয়ান্ট' যেখানে গরহাজির, সেখানে তো আনন্দই আনন্দ। স্যামুয়েল জনসনের 'দ্য হিস্ট্রি ওফ রাসেলাস, প্রিন্স ওফ এবিসিনিয়া' (১৭৫৯) বইয়ে রাজপুত্র রাসেলাসের দেশ যেমন – দুর্গম বন-জঙ্গল থেকে সুরক্ষিত, দুরারোহ পাহাড়-পর্বতে বেষ্টিত, সুরম্য এক উপত্যকা তা, নাম তার 'হ্যাপি ভ্যালি'। নিখাদ সে-সুখের কন্দরে আর সব আছে, নেই শুধু অ-ভাব, নেই বঞ্চিত হওয়ার বেদনা। সুনিবিড় ওই শূন্যতাই একদিন গ্রাস করে রাসেলাস-কে। আনন্দের প্রাকারে বন্দী, আবিসিনিয়ার দুর্গেশনন্দন রাসেলাসের কেমন-কেমন করে মন। কোথায় তার সমস্যা, কেনই বা নামছে চিত্তে, ঘনাচ্ছে কেবলই বিষাদের ঘোর, বুঝতে চালায় সে নিজের ওপর মন-বিশ্লেষণী তদন্ত। আঠার শতকীয় 'প্রাচ্য-কাহিনী', 'ওরিয়েন্টাল টেল'-এর কেতায় লেখা ইংরেজি নীতি-উপন্যাস 'রাসেলাস'-এর তৃতীয় পরিচ্ছেদে (শিরোনাম যার "দ্যা ওয়ান্টস্ ওফ হিম দ্যাট্ ওয়ান্টস্ নাথিং") উপলব্ধি করে দুঃখী (কপিলাবস্তুর সিদ্ধার্থ-সুলভ) নায়ক, কোনো কিছু চাইতে না জানাটাই তার অসুখের কারণ ("দ্যাট্ আই ওয়ান্ট নাথিং . . . ইস দ্য কস্ ওফ মাই কমপ্লেন")। ১৮ শতক, ১৯ শতক পেরিয়ে, ১৭৫৯-এর প্রায় ১৭৫ বৎসর পর, ১৯৩৩-এ প্রাচ্য ভূখণ্ডের ভাষা বাংলায় পাওয়া গেল রাসেলাস-প্রতিম এক রাজকুমারকে। তারও সব আছে – আছে মান, অর্থ, সচ্ছলতা, আর সেই সঙ্গে অতি-নিরূপিত, সংগত-সুন্দর এক জীবন-যাত্রা। ফলত,

Scanned with CamScanner

সব সত্ত্বেও তার নেই নিজস্ব কোনো অর্জন, নেই নামমাত্র কীর্তি। সুন্দরের পাহারাদারিতে ক্লান্ত (বাংলা-ভাষী) রাজপুত্র-ও, (আবিসিনিয়ার রাসেলাসের মতোই), মনোরম উদ্যানতুল তার দেশ-ঘরের বাইরে বেরোতে ব্যাকুল, অনিশ্চয়তায় ভরা পৃথিবীকে দেখতে উৎসুক। অনিশ্চয়তার প্রতি তার (ভাষা-অতিরেকী) উদ্দাম টান-কে লক্ষ করেই রোখা তাকে যাবে না বুঝেই, মন্তব্য করেন 'হাসিখুশি' দেশের রানি, রাজপুত্রের মা : "বুঝেছি, বাছা, আসলে তোমার অভাবটা অভাবেরই অভাব। রাজপুত্রের স্বদেশ নিরাপদের খাঁচা বই আর কিছু না — সেখানকার বুনোজন্তুরাও আফিমখোর, 'অহিংস্রনীতি'-তে দীক্ষিত। নিরুপদ্রব ওই মঙ্গললোক থেকে উৎক্রান্ত হয়ে, (লক্ষ্মী না সই, অলক্ষ্মীকে তো পাবেই, ভেবে) রাজপুত্র যে শেষমেশ পৌঁছয় হাস্যনিষিদ্ধ চালসর্বস্ব শুচিশ্লীল 'তাসের দেশে', সে অন্য গল্প। বর্তমান আলোচনার পক্ষে শুধু এটুকু খেয়াল রাখাই যথেষ্ট যে, 'একটা আষাঢ়ে গল্প' (১৮৯২) থেকে 'তাসের দেশে'র প্রথম সংস্করণ (১৯৩৩) হয়ে 'তাসের দেশে'র দ্বিতীয় সংস্করণে (১৯৩৮) এসে, নাটকের সূচনা-গীতি হিসেবে রবীন্দ্রনাথ জোড়েন 'খর বায়ু বয় বেগে' গানটি। আর সে গানে মেলে নাও-ভাসানিয়া এই সব পদ :

শৃঙ্খলে বার বার
ঝন্‌ঝন্‌ ঝংকার, . . .
বন্ধন দুর্বার
সহ্য না হয় আর

'ভূত' বিষয়ে দু-চার কথা

চরণে 'চৌকুনি নুপুর', 'খিটখুট্ খিটখুট্ শব্দে', যারা দিবাময় সরগরম রাখে 'ছুতোরের তৈরি কাঠের কুঞ্জবন', তাদের ক্রিয়াকলাপ যতই নিপুণ দৃষ্টিনন্দন হোক, তাতে থাকে না আত্ম-সমীক্ষণ বা 'সেলফ্-রিফ্লেক্‌শনে'র অবকাশ। কিন্তু আবার, এমন দেশ-ও কল্পনা করা সম্ভব, (সে-দেশের ভৌগলিক বাস্তবতা থাক বা না থাক), যেখানে, ছান্দস মাত্রা-শাসন সত্ত্বেও মান পায় অনির্দেশ্য গন্তব্যে পৌঁছনোর সখ-স্বাধীনতা। অর্থাৎ, দু-ক্ষেত্রেই অভীষ্ট, 'বন্ধনে'র শ্রী – তফাত কেবল, অচলায়তনিক পরিসরে 'বন্ধন' এমনই স্থির এক উৎক্রান্ত-বিন্দু যে যাত্রা শেষ হয় একই রূপকল্পে,

Scanned with CamScanner

আর মুক্তাঞ্চলে যাত্রা সমাপ্ত হয় অজান কোনো বাঁধন-লীলায়।

(রোমান্টিক কারুবাসনার ফেরে) 'বাঁধন' বস্তুটির অকারণ দানবায়ন, 'ডিমনাইসেশন্'-এ বড়ই অভ্যস্ত আমরা। সে-অভ্যাসের জেরেই বন্ধন/মুক্তি, স্থিতি/গতি, অচলতা/সচলতা, নিষ্ক্রিয়তা/সক্রিয়তা, অর্ডার/জিস্অর্ডার ইত্যাদি জোড়-শব্দকে বিপরীতের বনাম-সন্ধিতায় বসিয়ে নেয়ার নেপথ্য চাড় থেকেই যায় আমাদের। তার দরুনই মনে হতে পারে আমাদের, ('নির্ঝরের স্বপ্নভঙ্গ' - তাসের দেশ-এর প্রণেতা) রবীন্দ্রনাথের জন্মদিনে-২০ ও (বাংলা শব্দতত্ত্ব-ছন্দ-র প্রণেতা) রবীন্দ্রনাথের ছড়া-র 'ভূমিকা'য় 'অর্থ' বিষয়ে উলটো দুই বক্তব্য আছে : ছড়া-র ভূমিকায় অর্থময়তার ভিত হল 'বন্ধন' আর জন্মদিনে-র বিশের কবিতায় অর্থনাশকতার উপায়, ভিত-কাঁপানো বন্ধনমোচন, এবং দুটিকে মেলাবার মতো ঐক্যসূত্র কিছু নেই। (অনায়াস, মসৃণ) এ চিন্তন-কে অতিক্রম করতে, একটা কোনো 'ঐক্যসূত্র' নিশ্চয় দরকার – কিন্তু, সে সূত্র যদি 'মেলাবেন তিনি, মেলাবেন'-ন্যায় আস্থা-আস্তিক্যের অতিরিক্ত আর কিছু না জোগায়, তাহলেও বিপদ। বাস্তবিক, 'বন্ধন' তুল্য অনন্তর সংকট-সম্ভব, ফ্যাসাদে তত্ত্বকল্প/ক্যাটাগরি খুব অল্পই আছে। এখনকার মতো তাই, কেবল এটুকু বলেই (মেপে মেপে, অতি সাবধানে) অগ্রসর হতে চেষ্টা করছি :

ক. 'বন্ধন' শব্দে আছে নেতিময় ইশারা। অন্তত, বিশেষ এক স্তরে, না-বাচকদিগন্ত, 'নেগেটিভ হরাইজন্'-এর প্রতিশব্দ তা। 'বন্ধন' যেন সেই সীমানা, যেখানে বর্শাধারী শান্ত্রীর প্রহরা লাগে না। পৌঁছলে সেখানে, আপনা হতেই বোঝে লোকে, 'এই পর্যন্ত, আর না'। সীমা-আরোপি শর্তের সমবায় 'বন্ধন' - স্বাভাবিকতায় অনমনীয়, সম্ভবনায় নির্বিকল্প, অনতিক্রম্য। ওই শর্ত-পরিসরে যা গঠিত হয়, তা-ই মানুষের বিচরণ-ভূমি। বিচরণ-ভূমিতে (নিদেন তত্ত্বের পরিমণ্ডলে) নিষেধ-বেড়ি কিছু নেই - ব্যক্তিক দেখনদারির রঙ্গমঞ্চ তা। অতএব, 'পাগল বস্তুর দলে' ভেড়ে না যে, সীমার বাস্তবতা অস্বীকার করে 'শূন্যেতে দিকহারা' হয় না যে, তারই থাকে খেলার প্রতিভা, নিতুই নব নির্মাণের ক্ষমতা। ভাষার বেলায় যেমন, অন্বয়-বিধি, পদ-পরিচিতি, শব্দে শব্দ, বাক্যে বাক্য যোজনার কোড-গূঢ়লেখ, অর্থ-আকাঙ্ক্ষা প্রভৃতি, মানুষের (শিক্ষিত/অর্ধশিক্ষিত/অশিক্ষিত/সহজাত পটুত্বে) রপ্ত বলেই না ব্যক্তি-উচ্চার শ্রাব্য, বোধ্য, সামাজিক হয়, চলে পরস্পরে বাক-বিনিময়।

Scanned with CamScanner

খ. কিন্তু আবার, 'সামাজিকতা' জিনিসটি তো চিরন্তন কিছু না। সুতরাং, যে 'বন্ধনে' উপলব্ধ হয় 'সামাজিকতা', তা-ও শাশ্বত না। এর মানে :

১. নির্দিষ্ট স্থানপর্বে যাবতীয় ব্যক্তিক উক্তির অবতলে (নীরবে) কাজ করে চলে ভাষাতান্ত্রিক অনুশাসন। স্থানানুক্রমিক শৃঙ্খলা বা *সিনক্রনিক অর্ডার* নিরিখে, মূর্ত, *কংক্রিট* সমস্ত উক্তি বা *পারোল* এর তলায় তলায় থাকে বিমূর্ত, *অ্যাবস্ট্রাক্ট* ভাষাতন্ত্র বা *লাং*-এ (গোপন) নিয়ন্ত্রণ। আর কারো কথা যে আদৌ গোচরে আসে আমাদের, তার কারণ, ব্যাকরণের (অগোচর) উপস্থিতি।

২. এই সঙ্গে বড় কথাটা হল, ব্যাকরণ-ও বানিয়ে তোলা পদার্থ। কালানুক্রমিক বা *ডায়াক্রনিক* অক্ষ ধরে এগোলে মিলবে ব্যাকরণের সঞ্চার-পথ। দেখা যাবে তখন, আজ যে ভাষাতন্ত্র বা *লাং*-কে অমোঘ জ্ঞান করি, তারও আছে ইতিহাস। জগদ্দল পাথর নয় *লাং*, নয় অনড়, অক্ষয়। বহু মানুষের তালুর ছাপ, হাতের ছাপ বহন করছে তা। অনেকের অনেক টানটোন মিশে তাতে। ভাষিকতার অন্তরালে অবস্থিত, আজকের বিমূর্ত যে *লাং*, তাতেও প্রচ্ছন্ন আছে বহমান সময়ের দাগ। না নিশ্ছিদ্র *লাং*, না সময়ের পরপারে বা ভাষার বহির্দেশে তার রাজ।

গ. উপরুক্ত দুই সূত্র (খ ১ ও খ ২) এক করলে বক্তব্য দাঁড়ায় : 'বন্ধন' যেমন অনিবার্য, তেমনি আপতিক-ও। এক শব্দে, 'বন্ধন', নির্মিতি বিশেষ – হাজারো উপস্থাপনার অবলম্বন যেমন, তেমনি গাঁই-কুলের বিচারে, নিজেও এক প্রকারের উপস্থাপন বা 'রি-প্রেসেন্‌টেশন্‌'।

ঘ. 'বন্ধনে'র অনিবার্যতা বিষয়ে বেখেয়াল যে, তাল-মান থাকে না তার কথা বা বার্তার; আবার, 'বন্ধনে'র আপতিকতা বিষয়ে বেখায়াল যে, নিয়মের নামে বাঁধা পড়ে সে অবিচলতার বিভ্রমে। যে প্রক্রিয়ায় বাস্তবঘন হয় ওই দুই আতান্তর, তাকেই আখ্যা দেওয়া যায় : 'বিস্মরণ'।

ঙ. 'বিস্মরণ' মানেই যে ভ্রংশতা, মস্ত ক্ষতিকারক ব্যাপার, তা-ও নয় অতএব। 'বিস্মরণে'র সৎসাহস নেই, তা-ও 'বন্ধন-মোচনে' উদগ্রীব আমি, কল্পনা হিসেবে এ তো উদ্ভট, আকাশকুসুমের চাইতেও উদ্ভট। গোলমাল এড়াতে, 'বন্ধনে'র অনিবার্যতা ও 'বন্ধনে'র আপতিকতা বিষয়ে বেখেয়াল হওয়ার দুই ঘটনাকে

পৃথক করতে, দ্বিতীয়টির জন্য বরাদ্দ করা যাক স্বতন্ত্র একখানি অভিধা। বলা যাক, ব্যাকরণের সাময়িকতা, বন্ধনের আকস্মিকতা, নির্মিতির কারুতন্ত্র ইত্যাদি সম্পর্কে ওয়াকিবহাল নয় যে, 'বিস্মৃতি'র শিকার সে। অর্থাৎ বিস্মৃতি বিশেষ এক ধরনের 'বিস্মরণ'। ওই *বিস্মৃতির* বশেই ব্যাকরণ-প্রকৃতিকে চিরাচরিত, ইতোপ্রস্তুত, স্বয়ম্ভু, এককথায়, সর্বদাই 'ভূতপূর্ব' ঠেকে মানুষের।

স্পেক্‌টার্স ওফ্ মার্কস্ : দ্যা স্টেট ওফ দ্য ডেট, দ্য ওয়ার্ক ওফ মোর্নিং, এন্‌ড্ দ্য নিউ ইন্টারনেশানাল্ (মূল ফরাসি : ১৯৯৩; ইংরেজি অনুবাদ : ১৯৯৪) গ্রন্থে ভৌতিকতার পুরাণপঞ্জি নিয়ে মন্তব্য করেছেন জাঁক দেরিদা : সাধারণভাবে ভূতে বিশ্বাস মানেই হল, কোনো উপস্থাপনা-কে স্বসিদ্ধ জ্ঞান করা, তার পত্তন ও হয়ে-ওঠার ইতিবৃত্তকে ভুলে যাওয়া ("বিলিফ ইন দ্য গোস্ট্ ইন জেনেরাল, কন্‌সিস্টস ইন্ অটোনোমাইজিং এ রেপ্রেসেন্টেশন্ এন্‌ড্ ইন্ ফরগেটিং ইটস জেনেসিস্ এস্ ওয়েল্ এস্ ইটস্ রিয়েল গ্রাউন্ডিং")। (সরকারী) সমাজতন্ত্রের বিশ্বজোড়া পরাভব ও তৎজনিত উদ্দীপনা (ও নৈরাশ্যের) প্রেক্ষিতে আয়োজিত আলোচনা-চক্র 'হুইদার মার্কস্‌ইজম'-এ প্রদত্ত বক্তৃতায় (২২-২৩ এপ্রিল ১৯৯৩) ভূততন্ত্রের ভবিষ্যৎ নিয়ে বলতে গিয়ে কার্ল মার্কস্-এরই দোহাই পেড়েছিলেন দেরিদা। মনে করিয়ে দিয়েছিলেন, প্রেতযোনিতে মতি যদি 'কার্য' হয় তাহলে তার 'কারণ' যে 'বিস্মৃতি', তা সবচেয়ে খোলসা করে গেছেন মার্কস্। এঙ্গেল্‌স-এর সহযোগে, ১৮৪৫-৪৬-এ মার্কস্ লিখেছিলেন দ্য জার্মান আইডিওলজি। ধুলোই জমাচ্ছিল তার পাণ্ডুলিপি, বাতিল কাগজের স্তূপে-বান্ডিলে ধূসরই হচ্ছিল অবিরল। মার্কসের জীবৎকালে, মানুষী সমালোচকদের (শ্যেন) দৃষ্টি পড়েনি সে কাগজগুচ্ছে — নেংটি ইঁদুরদের দাঁতচিহ্নবহ সাংঘাতিক যে সমালোচনা, কেবল তা-ই জুটেছিল তার। বিশ শতকের গোড়া থেকে অল্পে অল্পে কাটতে শুরু করে দ্য জার্মান আইডিওলজির প্রতি অমানবিক অবহেলা। ১৯০৩ থেকে ছাড়া ছাড়া ভাবে আরম্ভ হয় ছাপা – অবশেষে, ১৯৩২-এ, জার্মান ভাষায় গোটা মুদ্রিত হয় তরুণ মার্কসের মতাদর্শ-বিষয়ক (দু)র্ভাবনা। আর মাত্র এই সেদিন, ১৯৬৪-এ, প্রকাশিত হয় মূলের ইংরেজি তর্জমা : দ্য জার্মান আইডিওলজি। কোন্ তিন চক্রে ভূত হয় ভগবান, তৈরি হয় ইতিহাস-বোধে

Scanned with CamScanner

'ভাবাত্মা'র প্রতিপত্তি, 'হেজিমনি অফ্ দ্য স্পিরিট ইন হিস্ট্রি', তার হদিশ এই বইতেই ('দ্য রুলিং ক্লাস এন্ড রুলিং কন্সাস্নেস্' অধ্যায়ে) মেলে। মার্কস্-মতে সে তিন চক্র :

ক. নানা আপতিক কারণে, নিতান্ত 'দৈবে'র বশে, গোলেরই যোগে নেহাত, সমাজপতি হিসেবে রাজ-বিরাজ করেন কতিপয় রক্ত-মাংসের মানুষ। এ সমস্ত চেপেচুপে, সমাজে প্রাধান্যময় ধারণাবলির উৎপাদন-পরিস্থিতি থেকে 'ধারণা'-কে বিযুক্ত করে নাও। 'ধারণা'-কে যা কিছু ধারণ করে সে সব ভুললেই গাঁথা যায়, তোলা যায় স্বনির্ভর, স্বচ্ছ-অনাবিল 'ধারণা-ধর্মে'-র জয়নিশান।

খ. এবার, (এলোমেলো) ধারণাপত্রের ওপর বোলাও শৃঙ্খলার জাদুদণ্ড। সাজিয়ে নাও তাদের, গুছিয়ে নাও। মনে হোক, বিভিন্ন ধারণার ভেতর, তলায় তলায় তাদের, বিধৃত আছে নিখুঁত ঐক্যসূত্র — পার্শ্বিক, বাস্তবিক কোনো যোগাযোগে নয়, আপনা হতে, আপন জোরেই উদ্‌বর্তিত হয় বিশিষ্ট কোনো অধিধারণা বা *তত্ত্বকল্প* ('একট্স্ ওফ সেলফ্-ডিটারমিনেশন্ ওন দ্য পার্ট ওফ দ্য কন্সেপ্ট')। *তত্ত্বকল্পের* ক্রমবিকাশের গাথাই অতএব 'ইতিহাস'।

গ. এখনও কিন্তু 'ধারণা'র তত্ত্বমূলে লেগে (সন্দেহজনক) রাহসিক, 'মিস্টিকাল' ছায়া। অতঃপর তাই, যুক্ত কর তাতে ব্যক্তিনামসত্তার সই। ধুয়ো ধর, আত্ম-চৈতন্যের, 'সেলফ্-কন্সাস্নেস্'-এর। যদি ভয় হয়, ব্যক্তি-এককের নামগানে বিপদ আছে, ভাববাদী বলে আক্রান্ত হওয়ার ঝুঁকি আছে, তাহলে নামে নামে রাঙিয়ে নাও ভুবন। নিজেকে আগপাশতলা বস্তুতান্ত্রিক ('থরলি মেটেরিয়ালিস্টিক') হিসেবে জাহির করতে, জপাও, আছেন অনেক ভাবুক ('থিংকার'), দার্শনিক ('ফিলোসফার') বা তত্ত্ববাগীশ ('ইডিওলজিস্ট'), যাঁরা ওই 'তত্ত্বকল্পে'র (কেবল, তল্পিবাহক কেন,) প্রতিভূও। চৈতন্যবান তাঁরা; নিরাবয়ব অধিধারণা-টি মগ্ন তাঁদের মধ্যে, মূর্ত তাঁদের মাধ্যমে। (নীতিসার : জনতা যদি নিশ্চিন্তে মূর্তিপূজায় কালব্যয় করে, তবে আখেরে সমাজেরই পুণ্য — খুশ রইবে গণদেবতাগণ তবে না গণসমূহের উপকার।)

Scanned with CamScanner

এই ত্রিচক্রের অন্তে দশা যা দাঁড়ায় বস্তু-উপাদানের ('মেটেরিয়ালিস্টিক এলিমেন্টস্'), মার্কসের উপমায় তা হল, পানি-বিন মীনের। মন লীন মাছের 'মাছত্বে'; খেয়াল নেই আর, নদীজল ব্যতিরেকে সম্ভবই নয় মৎস্যের অস্তিত্ব ("দ্য 'এসেন্স' অফ্ দ্য ফিশ ইস ইটস্ 'এক্সিস্টেন্স', ওয়াটার")। ফলত, জল-বিল-খাল গেল কিনা কলকারখানার ভোগে, কারখানা-জাত বর্জ্যপদার্থের ডাঁই-ভিড়ে বিষে নীল কিনা মাছেদের বাস-দেশ, এ-সকল (দৈনন্দিন, খুচরো) খবর অবান্তরই ঠেকে। মাছ-ধারণার অধিবিদ্যায় মজেছে যে, তার কি আর সাংসারিক কার-বিকারের কেচ্ছায় কান দিতে ভাল্লাগে। যাক নদী, যাক জল, রয়েছে তো মাছের নির্বিকল্প ছাঁদ, তার 'শাঁস', আছে তো সে 'শাঁসে'র অছি-সম্প্রদায়, লোকমান্য যত চিন্তার নায়কদের জোট। এই তালেগোলে, (লম্বা হয় শতাব্দীর ছায়া), দীর্ঘ থেকে দীর্ঘতর হয় শাঁস-সর্বস্ব তবু অন্তঃসারশূন্য কূটস্থ নানা ধারণার প্রেত-ছায়া। ভৌতিক এ উপস্থিতিকে কায়েম রাখার একমাত্র উপায়, কোন্‌ভাবে গড়ে ওঠে 'ধারণা', কত বিসর্পিল সঞ্চারে, বিরোধে বিরোধে দীর্ণ কত প্রক্রিয়ার মিলমিশে, রূপ নেয় তা, (জোড়াতালির, জড়াপট্টির) সে বৃত্তান্তটিকে আবছা, ধোঁয়াটে করে ফেলা। এর অর্থ, ভূতে বিশ্বাসের সঙ্গে অন্তর্লীন সম্পর্ক রয়েছে 'উপস্থাপনা'-র রকমসকম সম্বন্ধে (গভীর) ঔদাস্যের। তরুণ মার্কস্-ই লিখেছিলেন : আমাদের ঘিরে কোলাহল করে যত ভূত, ধাঁধায় যারা আমাদের, তাদের প্রত্যেকটিই *উপস্থাপিত* হয়েছিল একদিন। উপস্থাপনাকে চৈতন্যের অন্তর্গত জ্ঞান করা, ভাবা যে, (নির্মিত) উপস্থাপনা চিরনিহিত, প্রাক-সঞ্চিত আছে মানুষের মস্তিষ্ককোষে, তাহলে আর কিছু না, কেবল উপস্থাপনাকে বস্তু-বিলগ্ন করে নেওয়া। বিলগ্নিকরণের ওই কৌশলেই প্রাদুর্ভব হয় 'আত্ম-চৈতন্যে'র মতো স্নিগ্ধ, আরামদায়ক (হেগেলিয়) প্রত্যয়, (বানানো যত) 'ধারণা' রূপান্তরিত হয় ঘন আবেশে, জমাট-বাঁধা অচল আয়তনে ("অল্ দ্য স্পেকটার্স হুইচ হ্যাভ ফিলড্ বিফোর আস্ ওয়ের রিপ্রেসেন্টেসানস্। দীস রিপ্রেসেন্টেসানস্ ... রিপ্রেসেন্টেসানস্ আন্ডারস্টুড এস রিপ্রেসেন্টেসানস্ ইন্‌টার্‌নাল্ টু কন্‌সাস্‌নেস্, এ্যাস থটস্ ইন পিপলস্ হেডস্, ট্রান্সফারড্ ফ্রম দেয়ার অবজেকটিভিটি, এলিভেটেড ফ্রম সাবস্টেনস্ ইনটু সেলফ্-কন্‌সাস্‌নেস্, আর ওবসেসানস্ অর ফিক্সড্ আইডিয়াস")।

আশ্চর্যের কিছু নেই, উপস্থাপনার বকলমে উপস্থিতিকে মহিমামণ্ডিত করার,

'উপস্থিতির অধিবিদ্যা', 'মেটাফিসিকস্ অফ্ প্রেসেন্স'-এর (কঠোর) সমালোচক যিনি, সেই জাঁক দেরিদা তাঁর ১৯৯৩-এর স্পেকটার্স অফ মার্কস্ গ্রন্থে, প্রায় ১৫০ বছরের ব্যবধানে, ঠিক উপরোক্ত মন্তব্যটিই উদ্ধৃত করেছেন (দ্রঃ পৃ ১৭১)। এও কাকতাল নয় যে, মতাদর্শ বা 'ইডিওলজি'-র সংজ্ঞা পেতে দেরিদা উপনীত হয়েছেন মূর্তিপূজার, হৃদয়-মাথায় খোদাই-করা স্তম্ভিত নামরূপাবলির অর্চনা প্রসঙ্গে : মতাদর্শ কী ? — তাকে কি, *বিগ্রহের উত্তরাধিকারের* সঙ্গে ওতপ্রোত যে *বর্তে থাকার* যুক্তি, তাতে অনুবাদ করে নেওয়া যায়? ("হোয়াট ইস্ ইডিওলজি ? ক্যান ওয়ান ট্রান্সলেট উইথ রিগার্ড টু ইট দ্য লজিক ওফ *সারভাইভিং* দ্যাট উই হ্যাভ জাস্ট গ্লিম্পসড় উইথ রিগার্ড টু দ্য *প্যাট্রিমনি ওফ দ্য আইডল?"* দ্রঃ পৃ ১৪৭)। ধরে নিতে আপত্তি নেই, উত্তরটি অনেকখানিই ইতিবাচক। হ্যাঁ — শিলীভূত-ধারণা, অধমর্ণ যত বিগ্রহের স্তুতি-স্মরণেই উৎপন্ন হয় উপস্থাপনা সংক্রান্ত বিস্মৃতি, পাকা হয় সে সূত্রে ইডিওলজির অনুকূল, নির্ভাবনাময় প্রতিবর্তক্রিয়ার মানানসই, চকমেলানো দেশ-পরিসর। এর তাৎপর্য, মতাদর্শের মোকাবিলায় নামা মানে ঘাড় থেকে কর্তার ভূত নামানোর (মরণান্তিক) চেষ্টা। চাইলেই, তুড়ি মেরে উড়িয়ে দেয়া যায় সমারূঢ়দের, অতীতের বোঝা ঝেড়ে ফেলে ঝরঝরে হাত-পা হওয়া যায়, এমনটি ভাবাও কিন্তু ভুল, নিঃবুদ্ধিতাই এক রকম। ভাঙতে হলে *প্যাট্রিমনি ওফ দ্য আইডল*, আলো-ভাস্বর বিগ্রহদের প্রদোষ-ছায়ে ঢাকতে হলে (দ্রঃ *টুইলাইট ওফ দ্য আইডলস্ : হাউ টু ফিলোসাফাইস উইথ এ হ্যামার* [১৮৮২]— ফ্রেডরিক নীৎসে), উত্তরাধিকারের বন্ধনকে সজ্ঞানে স্বীকার করাই যুক্তিসংগত।

ভাষাফেরে ব্যাপার দাঁড়ায় অতএব : যে সমস্ত লব্ধ আচার-বিশ্বাসকে আমরা নিত্য ধ্যান করি, তাৎপর্যে ধ্রুব জ্ঞান করি, ভাবি যে তারা ব্যাকরণে সম্মত, অনতিক্রম্য অন্বয়ে বদ্ধ, তাদের সে আঙ্কিক স্থিরতা বা 'ফিক্সিটি', নির্দিষ্টতা বা 'ফাইনালিটি'-র মর্মে চলিষ্ণুতার বেগ সঞ্চার করাই 'প্রায়োগিক-বোধবিচারী', 'প্র্যাক্‌টিকাল-ক্রিটিকাল' হওয়ার প্রমাণ (দ্রঃ থিসিস নং ১— *থিসিস অন্ ফয়েরবাখ* — কার্ল মার্কস্)। অর্থাৎ, খেলতে যদি নামতেই হয়, তবে এমনভাবে বাঁধতে হবে নতুন খেলার রশি, যাতে পূর্বতন যা, তা-ও যেন 'খেলা' রূপে প্রতিভাত হয়; এমন হওয়া চাই উপস্থাপনার ফিকির, যাতে বেরিয়ে আসে খবর, অনড় পাথর সমান

চেপে যা আমাদের মস্তিষ্কে, জ'মে যা মস্তিষ্কের কন্দরে, তা-ও আসলে 'উপস্থাপনা', আর দশটা 'রিপ্রেসেন্‌টেশন্‌'-এর মতোই বানানো। বীত, প্রাক্তন উপস্থাপনাই এ খেলার ভূমি; পাঠে পাঠে সংলগ্নতাই তার লীলার তট।

উত্তরাধিকারকে বাজিয়ে নিতে চায় যে, এক সেই পারে নিজের আত্মতার ইতিহাস ছকতে। আর, জ্ঞাতব্য যার, আত্মগঠনের কোন্‌ পরিবেশে, কোন্‌ পরিকল্পে, পেয়েছি আমি আমার (সংকুচিত) স্থান, সে তো "খেপে" উঠবেই। "অধীর বিদ্রোহী" অথচ "পাগল" নয়, দেখতে-শুনতে হবেই তাকে "অবিশ্রাম সারি সারি কুচকাওয়াজের" দৃশ্যধ্বনি — 'বন্ধনে'র ভিতর দিয়েই পৌঁছতে, ছুঁতে হবে 'বন্ধনে'র (অদৃশ্য-প্রায়, লোকবিস্মৃত) বেলাভূমি। এ বড় রঙ্গ জাদু, এ বড় রঙ্গ — পর-পাঠের দৌলতই যার আত্ম-পাঠের সরঞ্জাম, নামঞ্জুর তার তরলতার বিকার-বিলাস। পূজাসম্মোহ যেমন বারণ, তেমনি বারণ তার চণ্ডীমণ্ডপী তাচ্ছিল্য। মানে যে, 'সেলফ্‌-রিফ্‌লেক্সিটিভিটি' বা 'আত্ম-সমীক্ষণ' এবং 'ইন্‌টারটেকস্টুয়ালিটি' বা 'আন্তঃপাঠের চলাচল' সমার্থ, তাকে তো রপ্ত করতেই হবে অ-সহজ এক চপলতা। বিশেষ ও রসবোধে ঘাটতি যার, তাকে তো, কোথাও না কোথাও, কখনো না কখনো, পেয়ে বসবেই নীতিবাগীশের (ভয়াবহ) গাম্ভীর্য। আর, নীতিবাদিতার ব্যাধিতে গ্রস্ত যে, তার কি খেয়াল থাকে, ভূতের আরাধনা তথা রাজ্যের বাস্তুদেবতার পাদপীঠে ঘন ঘন শির ঠোকার অভ্যাসকে প্রশ্রয় জোগায় শুদ্ধতার ভড়ং — ওই ভড়ং-গুণেই, অন্তরে অন্তরে ধিকি ধিকি জ্বললেও, ছাইচাপা রয়ে যায় ন্যায়-নৈতিকতা সংক্রান্ত হাজারো অমীমাংসিত সওয়াল।

সন্দেহ কী, আন্তঃপাঠের খেলোয়াড়ি বেশ কঠিন — খুব অল্পজনই সাড়া দিতে পারে ওই "লীলার উপরোধে" (দ্রঃ 'চিঠিপত্র ২' (১৮ আষাঢ় ১৩২১), *ছন্দ* – রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর)। (মতান্তর-মনান্তরের ঝুঁকি সত্ত্বেও), অনেকেই হয়তো বলবেন, আমাদের সাংস্কৃতিক পরিমণ্ডলে, পাঠ-চালাচালি মজাদারির এ-যাবৎ শ্রেষ্ঠ ও সার্থকতম রসিক রবীন্দ্রনাথই। আর সত্যজিৎ রায়? তাঁকে কি ভুক্ত করা যায় এ তালিকায়? (আয়োজিত) *বিস্মৃতির* বিরুদ্ধে (সম্মুখ না হোক, পরোক্ষ) কোনো সমরের ইতিবৃত্ত কি সংগ্রহ করা যায় সত্যজিৎ রায়ের চলচিত্র থেকে? সেই সহ কি জায়গায় জায়গায় তার, মেলে *বিস্মৃতির* কাছে আত্ম-সমর্পণের দৃষ্টান্তও? কয়েকটি

Scanned with CamScanner

উদাহরণ বাছা যাক।

বিকীর্ণ উদাহরণ

উদাহরণ এক

সাল : ১৯৫৯। ছবি : *অপুর সংসার*। বিবর্ণ দশা নবযুবক অপুর – পকেটে পয়সা নেই, চাকরির স্থিরতা নেই, সংসার গড়ার আশা নেই – যৌবন-বেদনার আধিক্য সত্ত্বেও বড়ই হতশ্রী অবস্থা। বিষাদের সে পর্বেই, হঠাৎ একদিন অপুর শূন্য বাসায় হাজির হয় পুলু। কলেজে অপুর সহপাঠী ছিল পুলু – অপুর ভক্ত সে, অপুর সূক্ষ্ম সংবেদনশীল মনের সমঝদার। পুলুর উদার দাক্ষিণ্যে সেদিন অন্তত পেটে ভালো খাবার পড়ে সাধারণত আধপেটে-থাকা অপুর। রেস্তরায় খায় দুজনে, তারপর যায় থিয়েটারে। বন্ধু-সংসর্গ, উত্তম খাদ্য, নাট্য-বিনোদন – সব মিলিয়ে মেজাজ শরিফ অপুর। সাময়িক হলেও ছেড়ে গেছে বিষাদের যোগ, ফুটছে মুখে কথার খই, আবার চনমনে, চাঙ্গা অপু। নাটক দেখে ফিরছে দু-বন্ধু; হাঁটছে তারা ট্রেন-লাইন ধরে; নীরব কিন্তু দরদী, মনোযোগী শ্রোতা পেয়ে কলকলিয়ে বকছে অপু; শোনাচ্ছে পুলুকে তার সৃষ্টি-কল্পনার গল্প, লেখক হিসেবে তার আত্ম-প্রস্তুতির কাহিনী। কিন্তু, সে কোন্ নাটক যা দেখে এতটা উত্তেজিত, বেগে-আবেগে এমন বলকাচ্ছে অপু? নাটকটি বহু-প্রসিদ্ধ উনিশ শতকী প্রহসন : দীনবন্ধু মিত্রের *সধবার একাদশী* (১৮৬৬)।

উদাহরণ দুই

সাল : ১৯৬০। ছবি : *দেবী*। এখানেও দুই সুহৃত নাট্য-প্রাঙ্গণে উপস্থিত। নাটক আবার সেই *সধবার একাদশী*। প্রহসনটির দর্শকযুগলের মানসিক অবস্থা কিন্তু বেশ করুণ। তাদের একজন, উমাপ্রসাদের তো অদ্ভুত এক উপায়ে সদ্য স্ত্রী-বিয়োগ ঘটেছে। পিতা তার – যেমন বিত্তের তেমনি সামাজিক প্রতিপত্তির অধিকারী, শাক্ত সুপণ্ডিত কালীকিঙ্কর – স্বপ্নে পেয়েছেন প্রত্যাদেশ, দেবীপ্রসাদের ধর্মপত্নী দয়াময়ী এলেবেলে সাধারণ নারী নয়। নিদ্রার আবেশ-আঁধারে প্রাপ্ত সে দৈববাণী রটে গেছে চতুর্ধারে – দেশ-গাঁ জুড়ে উঠেছে ধন্যি ধন্যি রব – আবালবৃদ্ধবনিতার মুখে মুখে ফিরছে একটাই কথা, কালীকিঙ্করের ঘরে, ছোটোবউয়ের ছদ্মবেশে, উদিত

Scanned with CamScanner

হয়েছেন স্বয়ং আদ্যাশক্তি। বউ যার — চেহারায় হলেও বা অবলা বঙ্গবালা-স্বরূপা — বহুবলধারিণীং রিপুদলবারিণীং শ্রী শ্রী তারিণীং তারা, তার কি আর স্ত্রীর অঙ্গস্পর্শের হক থাকে? উমাপ্রসাদ তাই, পিতার স্বপ্নযোগের সৎপরিণামে, বিবাহিত হয়েও বিপত্নীক।

উমাপ্রসাদের মিত্র, প্রাণচাঞ্চল্যে ভরপুর, রঙ্গতামাসায় সুনিপুণ ভূদেব চাটুয্যেরও চলছে মহা-সংকট। জনৈক বিধবার প্রেমে পড়েছে সে। ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগরের আন্দোলনের জেরে, ফিরিঙ্গি ব্রিটিশ রাষ্ট্রের পোষকতায়, বিধবা-বিবাহ কানুনি স্বীকৃতি পেলেও, ভূদেবের বাবা পরিণয়-জড়িত আধুনিকতার ঘোর বিরোধী। হুমকি দিয়েছেন তিনি, উদ্যোগী পুত্রের গৃহবিপ্লবকে স্বাগত তো জানাবেনই না, উলটে, ত্যজ্যপুত্র করে সাংসারিক ব্যবস্থার পথিকৃৎকেই বসাবেন পথে। প্রহসন-ট্রহসন নয়, রীতিমতো ট্রাজিক ভূদেবের কেস। তার "হ্যামলেট হ্যামলেট ভাবে" কৌতুকই অনুভব করে উমাপ্রসাদ। ইয়ার্কি নয়, একে বাঙালি তায় বিধবা 'জুলিয়েটে'র সঙ্গে "রোমিও" পণার মাশুল যে কী ভীষণ, তা ভূদেবই ধরিয়ে দেয় : সেরেফ "হ্যামলেটে"র কেন, "ম্যাকবেথ, ওথেলো, কিং লিয়ার", শেক্সপীয়রের যাবতীয় ট্রাজিক কুশীলবের 'সমূহ পতনে'র যোগফল কপালে তার নাচছে। বিষাদে হরিষ — হাসতে হাসতেই কথা দেয় উমাপ্রসাদ, ভূদেবের বাবার সঙ্গে ভূদেবের পক্ষ নিয়ে "ডিবেট" লড়ে আসবে সে। বিধবা-বিবাহ বিষয়ক প্রস্তাবের মামলায় নখ তার দর্পণ-সমান। আঙুলের নখ দেখিয়ে বন্ধুকে বলে উমাপ্রসাদ : "কনভিন্স করবো। বিদ্যাসাগর মশাইয়ের সমস্ত আরগুমেন্ট আমার এইখানে —"। মোট ব্যাপার : মঞ্চে যখন *সধবার একাদশী* দেখছে ভূদেব-উমাপ্রসাদ, দুই যুবকই তখন তাদের পিতৃদেবের ভাবগতিকে সাতিশয় বিড়ম্বিত।

নিঃসন্দেহে, তারা সেদিন দারুন উপভোগ করেছিল, নানা বিদ্যায় পারদর্শী তবু ক-অক্ষর গো-মাংস বাবু অটলবিহারীর সভাসদ, শেক্সপীয়র-কন্ঠস্থ পণ্ডিত-মদ্যপ নিমচাঁদের চ্যাটাং চ্যাটাং ডয়ালগ। বারবণিতাসক্ত অটলের মুখ থেকে নিমচাঁদের এ মধুর উক্তি শুনে নিশ্চয় প্রভূত আমোদ পেয়েছিল বিবাহ-ভণ্ডুল দু-ভদ্রসন্তান : "নিমচাঁদ বলেচে পরিণয়-নিবারণী সভা না স্থাপন কল্যে কোন ভদ্রসন্তান সুরাপান-নিবারণী সভার সভ্য হবে না" (প্রথম অঙ্ক, দ্বিতীয় গর্ভাঙ্ক)। *দেবী* ছবির

দর্শকদের কিন্তু নিমটক এ দাবিটি কর্ণগোচর হয় না। তবে, *অপুর সংসারে* না হলেও, *দেবী*তে এক ঝলক দেখা যায় *সধবার একাদশী*র অভিনয়। ওই যে দৃশ্য — ঘটিরাম ডেপুটির, দুর্নীতি যার স্বভাবজাত, সেই ডেপুটি ম্যাজিস্ট্রেট, কেনারাম ঘোষের চোদ্দো পুরুষ উদ্ধার করে যেখানে নিমে দত্ত :

> পাজি, তুমি পাজি, তোমার বাবা পাজি, তোমার বাবার বাবা পাজি, তোমার সাতপুরুষ পাজি, তোমার আদিশূরের সভা পাজি –
>
> (দ্বিতীয় অঙ্ক, দ্বিতীয় গর্ভাঙ্ক)

রবীন্দ্রনাথের প্লটালম্বনে রচিত প্রভাতকুমার মুখোপাধ্যায়ের 'দেবী' (১৮৯৯) গল্পের পটভূমি ১৮ শতক — বৈষয়িক কোনো প্রয়োজন নেই, তবু, "সম্প্রতি সংস্কৃত ছাড়িয়া সখ করিয়া" গল্পের (হতভাগ্য) নায়ক শিখছে, নবাবি আমলের রাজভাষা, "পারস্যভাষা"। সত্যজিৎ রায়ের ছবিতে ঘটনার সময়কাল কিন্তু একশ বছর এগিয়ে। ১৭৯৩-এর চিরস্থায়ী বন্দোবস্ত উত্তর, ১৮৩৫-এর নব্যশিক্ষানীতি উত্তর যুগের মানুষ সত্যজিৎ রায়ের উমাপ্রসাদ—স্বাভাবিক কারণেই ইংরেজিতে তার দখল পাকা, শ্যামলকায়-অন্তরালে মানসলোক তার ভাসিত পশ্চিমা জ্ঞান-বিজ্ঞানের শুক্ল আলোয়। দেখিনা কি আমরা, বউ-ছুট উমাপ্রসাদ যখন সদ্‌পরামর্শের আশায়, কলকাতায়, তার অধ্যাপকের দুয়ারে কড়া নাড়ে, ঠিক তখনই তার মাস্টরমশাই "প্রোফেসার সরকার" জ্বালেন লন্ঠন, উজ্জ্বলতর করেন ঘর — লাইটিং-এর হেরফেরে ভাস্বর হয় গোটা স্ক্রিন।

কালেজের ছাত্রমহলে "কাঠখোট্টা" "ভীতিপ্রদ" বলে প্রোফেসার সরকারের "বদনাম" রইলেও আসলে তিনি অত্যন্ত নরম-হৃদয়। তবে তাঁর বাছবিচারবোধ খুবই তীক্ষ্ণ। "ডিগ্রিস ওফ নিয়ারনেস"-এর অঙ্কে শেরিদান-এর চেয়ে শেক্সপীয়র যেমন তাঁর বেশি ঘনিষ্ঠ, তেমনি অন্য পড়ুয়াদের তুলনায় উমাপ্রসাদ তাঁর বেশি নিকট। উমাপ্রসাদকেই তাই, বধূমাতার পিতৃআরাধনায় বউ-বিচ্ছিন্ন ছাত্রকেই, নিজ জীবন-চরিত শোনান প্রোফেসার সরকার। নবীন যৌবনে তাঁর, উনিশ বছর বয়সে, পিতার সঙ্গে ঘটেছিল খটাখটি। পৈত্রিক সংস্কারের সঙ্গে খাপ খাচ্ছিল না তাঁর চিন্তা — অসন্তোষের পরিণামে ধর্মান্তরিতই হয়ে যান তিনি। অনেক "চোট", অনেক পোড়

খেয়েছেন প্রোফেসার – পিতৃ-নিগ্রহে অবসন্ন বিষণ্ণ ছাত্রকে তাই বাজে সান্ত্বনাবাক্যে বিদায় না করে, দেন আত্ম-প্রত্যয়ের বীজমন্ত্র : "তোমার বুদ্ধি, তোমার বিবেক, তোমার চেতনা যেটাকে সত্য বলে মেনে নিতে পারছে না, সেটাকে – তোমাকে একটা ডিসিসান নিতে হবে এবং তোমাকেই নিতে হবে। থাক্, আমি আর বিশেষ কিছু বলতে চাই না –"। স্বাবলম্বনের আমল উনিশ শতকে ব্যক্তসমস্যার সমাধান পেতে পিতৃস্থানীয় কোনো অছির দ্বারস্থ হওয়া যে আদৌ শোভন না, তা-ও ঠারেঠোরে জানিয়ে দেন প্রোফেসার। নষ্টনীড়ের পরিত্যক্ত পুরুষটিকে বলেন তিনি : "গোটাকতক বাছাই করা দার্শনিক উক্তি হয়তো তোমাকে শোনাতে পারি। কিন্তু সমস্যাটা তো আমার নয়, বা প্লেটোরও নয় –"।

স্ব-বুদ্ধি, স্ব-বিবেক, স্ব-চেতনায় সমৃদ্ধ আধুনিকতার পরিসরে, জীর্ণ পুরাতনকে ভাসিয়ে, 'ঐতিহ্যে' ছেদ ঘটিয়ে, নবীনতাকে বরণ করার মহোৎসবে, নিমচাঁদের 'পাজিত্ব' পাঁজি, বজ্জাতির কৌলীন্য-বিচার ও শঠতার ঠিকজুগুষ্টি, জাগায় এ খটকা –'আধুনিকতা'র প্রকল্প-মাঝারেই নেই তো 'বিস্মৃতি'র আয়োজন; ঔপনিবেশিক চৌহদ্দিতে, টিম টিম করে টিকে নেই, বরং আরোই যে প্রতাপশালী, আরোই যে প্রভাবশালী হয়েছে "আদিশূরের সভা", সামান্য সে 'ইতিহাস'টিই কি ভুলে মেরে দিয়েছি আমরা ? বাপের অযুক্তিময় অত্যাচারে উমাপ্রসাদের অসহায় নিষ্ক্রমণ ও ভূদেবের দারিদ্র-সম্ভাবনায় ব্যথা পাই আমরা ; আবার, অপরাজেয় অপুর আত্ম-উন্মোচনের পাঁচালিতে আলোড়িতও হই – এ সব সত্ত্বেও বাজতে থাকে কানে, বেজেই চলে, জ্ঞানপাপী নিমচাঁদের নির্মোহ-নির্মম উচ্চারণ : "পাজি, তুমি পাজি"। *দেবী* ছবিতেই, সিনেমার পর্দায় মঞ্চস্থ নাট্যাভিনয়েই শুনি, গালিগালাজে ক্ষিপ্ত হাকিম কেনারামের চিৎকার, "তুমি আমাকে পাজি বল্‌বে কেন? তুমিও পাজি"-র নিমচাঁদি জবাব : "বাবা, প্রমাণ দেব। না পারি, আমার মাতায় জুতো মারো, আমার বাবার মাতায় জুতো মারো, আমার বাবার বাবার মাতায় জুতো মারো, আমার গ্রেট গ্র্যান্ড বাবার মাতায় –"। সংলাপের বাকি অংশটা আর শোনা যায় না। তবে, পাঠে পাঠানুগমনে উৎসাহী পাঠক, *সধবার একাদশী* খুলে দেখে নিতে পারেন, কোন্ উৎসে গিয়ে থেমেছে নিমচাঁদের জুতো মারার পালা : "সহস্র পুরুষের মাতায় জুতো মারো, আমার কান্যকুব্জের মাতায় জুতো মারো –"।

Scanned with CamScanner

উদাহরণ তিন

দীপ-আলোকের সূত্রে ফের মনে পড়তে পারে আমাদের, *দেবী*র পাঁচ বছর আগে তৈরি, ১৯৫৫-র *পথের পাঁচালী*র বিশেষ এক দৃশ্য :

> আসন্ন-প্রায় দুর্গার মৃত্যু। ঘরের ভেতর অচৈতন্য মেয়েকে নিয়ে একা সর্বজয়া। দুর্যোগের রাত, হাওয়ার রাত — বাইরের বাতাসে ভাঙো ভাঙো ঘরের জানলা-কপাট। এই বুঝি ঢোকে দমকা ঝড়, ভাসিয়ে নেয় মৃত্যুপথযাত্রীকে। সন্ত্রস্ত সর্বজয়া। ঘরের কোণে মিটিমিটি জ্বলছে প্রদীপ, কাঁপছে দীপের শিখা। শিখার কাঁপনে কোন্ সর্বনাশের সংকেত। ক্যামেরার ফোকাসে ম্রিয়মান দীপ। নির্গত হবে দুর্গার প্রাণবায়ু, (বাংলা সিনেমার প্রচল-ব্যাকরণ অনুযায়ী, তালে তাল), দুপ করে নিবরে আলো — ছন্দ-মিলের এ দর্শক-প্রত্যাশা কি পূরণ করলে *পথের পাঁচালী* ?

না। দুর্গার শেষ নিশ্বাস পড়ল, কিন্তু, অনির্বাণ দীপ। পেশকারিতে বাংলা ছবির মরণ-দৃশ্য সচরাচর ভাবে-প্রবণ, আর্দ্রঘন। অনবরত, অন্তিম মূহুর্তের দ্যোতক হিসেবে পর্দায় আসে নিবু নিবু প্রদীপের ঝাপটা নির্বাপণ। *পথের পাঁচালী*-তে মৃত্যুকে ঘিরে ঘটে ফর্মাল, রূপকল্পগত যোঝাযুঝি। রেওয়াজি শৈলিকে উদ্ধৃত করার ছলে বেরেওয়াজি রকমের অবতারণা — উপস্থাপনার ওই প্যাঁচে, অমন সকরুণ পরিস্থিতিতেও, (রসিক) দর্শকের ঠোঁটে ফোটে মুচকি হাসি। (সন্তর্পণ) ওই কমিকতার ওজরেই *পথের পাঁচালী*র "একটুখানি দীপের আলো"-র "চারদিকে" "হঠাৎ এসে কথার ফড়িং ঝাঁপায়", নতুন পথ কাটে বাংলা ছায়াছবি।

উদাহরণ চার

সাল : ১৯৬৪। ১৯০১-এ লেখা রবীন্দ্রনাথের আখ্যান 'নষ্টনীড়' সিনেমার মাধ্যমে *চারুলতা*য় তর্জমায়িত। নিছক ছবিতে বলা গল্প নয়, 'নষ্টনীড়ে'র সিনেমাটিক অলংকরণ নয় *চারুলতা* - *চারুলতা* 'নষ্টনীড়ে'র তর্জমা। তর্জমার স্বাধীনতাতেই সত্যজিৎ রায়ের (রবীন্দ্র-নির্ভর) ছবিটি হয়েছে স্মৃতিক্ষেত্র বিশেষ — খাঁজে-ভাঁজে প্রচ্ছন্নতায় অসংখ্য অন্য পাঠ। দৃশ্য-দৃশ্যান্তর ভ'রে তার এ বইয়ের নামে, ও প্রবন্ধের শিরোনামে, অথবা গ্রন্থ-আহৃত চূর্ণ উক্তিতে। বাস্তবিক, সিনেমা-সাহিত্যের সহাবস্থানই

Scanned with CamScanner

চারুলতার দৃশ্য সংগঠনের যুক্তিচাতুরি, *mis en scene* এর চাবিকাঠি – যাবতীয় ভাষিক-শারীর মুদ্রা, মায় খাট-আলমারি-টেবিল-প্রেস, সবই সেখানে বইজগৎ থেকে বয়ে আনা, সবেতেই লেগে ছাপাক্ষরের দাগ। *চারুলতা* সাহিত্যিক উদ্ধৃতির সমবায় – উনিশ শতকীয় ভদ্রলোক (-ভদ্রমহিলা)-র স্বপ্ন-আশার কল যে ছাপাখানা, ছাপাখানা থেকে উৎপন্ন যে সাংবাদিকতা ও (আধুনিক) বাংলাসাহিত্য, ইংরেজি-দীক্ষিতদের যে vernacular চর্চা, তা-ই *চারুলতার* উপজীব্য এবং বিষয়বস্তু। 'সাহিত্য'কে সিনেমার ফ্রেমে বদ্ধ ক'রে, লিখন নামক ক্রিয়া-আঙ্গিক, performanceকেই ক্যামেরায় ধরে *চারুলতা*।

বাংলা সাহিত্য সম্পর্কিত যত উতোর-চাপান চলে *চারুলতায়*, তার কেন্দ্রে কিন্তু রবীন্দ্রনাথ নেই। চারুলতার সাহিত্যিক বয়ানের মর্ম-পুরুষ বঙ্কিমচন্দ্র। ছবির একেবারে শুরুতেই দেখি, ব্যস্ত স্বামীর নিঃসঙ্গ স্ত্রী, বড়লোক বাড়ির একছত্র কর্ত্রী, নিঃসন্তান সুশিক্ষিতা চারু, এ ঘর ও ঘর করছে ; বইয়ের তাক থেকে বই বাছছে, গুন গুন গুঞ্জন করছে আপন মনে, "বঙ্কিম, বঙ্কিম"। এর পর যখন, ঝড়ের এক দুপুরে, সহসাই উদয় হয় অমল, চনমনে-প্রাণ, উচ্চাকাঙ্ক্ষী, উঠতি সে সাহিত্যিক, "হরে মুরারে" শ্লোগান ছেড়ে চারুকে প্রথমেই প্রশ্ন করে : "বৌঠান, আনন্দমঠ পড়েছো ?" অমল একা আসে না ; সঙ্গে ক'রে বয়ে আনে সে বাংলা সাহিত্যকে ঘিরে যত যা টাটকা উত্তেজনা ; ভূপতির অন্দরমহলে (অজান্তেই) চালান করে দেয় সে বঙ্গিম হতে উত্থিত 'আনন্দে'র রসদ।

চারু-অমলের যৌথ-নির্জন পড়া-লেখায় চারুর ভাজ, বইবিহীন মন্দা, অবুঝের মতো বাধা হয়ে দাঁড়ায়। গোলামচোরের খেলায় পরগৃহাশ্রিত মন্দা আহ্বান জানায় অমলকে। অমলের অবশ্যই সহজতম ও তাসের খেলায় একফোঁটা আগ্রহ নেই - সাহিত্যরসপিপাসুর দরকার তখন, একান্তই দরকার, বুঝদার এক পাঠিকার। মন্দাকে ঘর থেকে উৎখাত করা না গেলে বিঘ্ন পড়বে (চারুর সহকারে উজল) তার সাহিত্যচর্চায়। মন্দাকে শুধোয় অমল :

মন্দাবৌঠান, তুমি প্রাচীনা না নবীনা ?

প্রশ্নটা যে হালকা ঠাট্টা নয়, এর পেছনে যে বড়সড় তাত্ত্বিক সমর্থন রয়েছে, তা বুঝিয়ে দিতেই যেন এরপর অমল সুর ক'রে বঙ্কিমের বহুবিদিত প্রবন্ধ 'প্রাচীনা এবং

Scanned with CamScanner

নবীনা'র (বিবিধ প্রবন্ধ, প্রথম ভাগ, ১৮৮৭) বিশেষ একটি অংশ পড়তে আরম্ভ করে : "যে স্ত্রী, ভূমণ্ডলে আসিয়া, শয্যায় গড়াইয়া, দর্পণসম্মুখে কেশরঞ্জন করিয়া, কার্পেট তুলিয়া, সীতার বনবাস পড়িয়া এবং সন্তান প্রসব করিয়া কাল কাটাইলেন, আপনার ভিন্ন কাহারও সুখ বৃদ্ধি করিলেন না, তিনি পশুজাতির অপেক্ষা কিঞ্চিৎ ভাল হইলে হইতে পারেন, কিন্তু তাঁহার স্ত্রী জন্ম নিরর্থক। এ শ্রেণীর স্ত্রীলোকগণকে আমরা গলায় দড়ি দিয়া মরিতে পরামর্শ দিই"। পড়েই জিগেস করে মন্দাকে :

তুমি কি এই শ্রেণীর ?

মন্দা না পারে কার্পেট বুনতে, না সে, বঙ্কিম যাঁকে স্রষ্টাপদবাচ্য গণ্য করতেই গররাজি ছিলেন (দ্র ঃ 'Bengali Literature' [১৮৭১]) সেই বিদ্যাসাগরের *সীতার বনবাস* পড়েছে ; বস্তুত, ভালো মতন অক্ষরজ্ঞানই নেই মন্দার। বঙ্কিমি তত্ত্বকল্পের নিরিখে মন্দা সুতরাং স্পষ্টতই 'প্রাচীনা'। প্রাচীনার সঙ্গে (কষ্টেসৃষ্টে) ঘরকন্না যদিও বা করা যায়, সাহিত্য-আলোচনা কভু না। অমল তাই এবার ভারিক্কি চালেই রায় দেয় :

প্রাচীনা এখন এ ঘর থেকে যাও। আমরা এখন সাহিত্যচর্চা করব।

তবে, (হলেও বা নিরক্ষর পুরাতনী), মন্দারও অহমিকা কম না — চারু-অমলকে নিরুপদ্রবে ছেড়ে যাবার পাত্রী নয়। ঘরেই রয়ে যায় সে – বালিশে মুখ গুঁজে, চারু-অমলের ভেতরটিতে এক চিলতে গোঁজের মতো। তাকে সম্পূর্ণ উপেক্ষা করেই চলে দুই সাহিত্যপ্রেমিকের তত্ত্বালাপ। অত উচ্চস্তরের কথাবার্তার প্রভাবেই বোধহয় অল্প পরেই নাক ডাকতে শুরু করে মন্দার। প্রাচীনার নাসিকাধ্বনিতে রণিত হয় অমলের হৃদয়ে বিশেষ একখানি বঙ্কিম-কীর্তির স্মৃতি। রোহিণী-ভ্রমর-গোবিন্দলালের ত্রিকোণ সম্পর্কের আখ্যান *কৃষ্ণকান্তের উইল*-কে কাজে লাগায় সে মন্দার অসময়ে সডাক দিবানিদ্রার লাগসই এক ব্যাখ্যা দিতে :

প্রাচীনার কাণ্ড দেখ, বঙ্কিমের কথা উঠতেই ভ্রমরের গুঞ্জন শুরু হয়ে গেল। অমলের জটিল এ সাহিত্যিক রসিকতা আর কেউ না বুঝুক, নবীনার সাক্ষাৎ প্রতিমা চারু নিশ্চয় বোঝে।

বর্ধমানের উকিল রঘুনাথ মিত্তিরের মেয়ের সঙ্গে অমলের সম্বন্ধ এনেছে ভূপতি। খবর আছে : জামাইকে ব্যারিস্টারি পড়তে বিলেত পাঠাবে শ্বশুর। অমলের বিলাত-যাত্রা সম্ভাবনায় যত না পাত্র, তার চেয়ে পাত্রের দাদা বেশি উত্তেজিত। তবু

Scanned with CamScanner

যেন চারুর উৎকণ্ঠা কিছুতে ঘোচে না। দেওরের অন্তঃকরণটা ভালো ক'রে পরখ করতে খোঁচায় চারু :

যাবে আগে বর্ধমান, তারপর বিলেত, তারপর ব্যারিস্টার –

কথায় কথায় জড়িয়ে পড়ে দুজন, 'ব' নিয়ে আদ্যাক্ষরী খেলায়। সংলাপ দাঁড়ায়

অমল। আগে বর্ধমান, তারপর বিয়ে, তারপর বিলেত, ব্রিস্টল -

চারু। তারপর ?

অমল। তারপর ব্যারিস্টার –

চারু। তারপর ?

অমল। তারপর ব্যাক টু বেঙ্গল, ব্ল্যাক নেটিভ, বাপ্ বাপ্ বলে - ব্যাস্ চারু।

চারু। বেঙ্গল ? ব্যাস্ ?

অমল। অ্যান্ড বঙ্কিম। বাবু বঙ্কিমচন্দ্র।

"বর্ধমান-বিয়ে-বিলেত-ব্যারিস্টার-ব্যাক টু বেঙ্গল-ব্ল্যাক নেটিভ" সেরে "বাপ্ বাপ্" বলে "ব্যাস্" এ খালাস পাবার জো নেই, আচমকাই সেটা উপলব্ধি করে অমল "বাবু বঙ্কিমচন্দ্রে" পৌঁছে। ততক্ষণে হাতে সে তুলে নিয়েছে (আধুনিক বাঙালির শিরোধার্য, গার্হস্থ্য কোষগ্রন্থ) বঙ্কিমের *বিষবৃক্ষ*। বলেছে ফিসফিসিয়ে :

অমল। (স্বগত) বিষবৃক্ষ –

"ব" নিয়ে ছেলেমানুষি বকমবকম এ কোথায় এনে ফেললে তাকে – সামনে যে তার অতল খাদ, সামনে যে চারুবৌঠান "ব"-র খেলাটি সম্পসারিত করেই চলেছে –

চারু। আর বৌঠান ? বিশ্রী ? বেহা –

হয়তো মাঝখানে তাদের (অপার সমুদ্দুর) *বিষবৃক্ষ* বইখানি, (বাবু বঙ্কিমচন্দ্রের সূক্ষ্ম গোপন পাহারাদারি), আছে বলেই, "বেহায়া" শব্দটি পুরো উচ্চারণ করতে বাধে চারুর।

ফেরা যাক *চারুলতার* গোড়ার সিকোয়েন্সে। দেখা যাক, মুখে "বঙ্কিম বঙ্কিম" সুর, অনেক ঝেড়ে-বেছে বইয়ের তাক থেকে কোন বই পেড়েছিল চারু ? উত্তর : *কপালকুণ্ডলা*। একগামী যুগলবন্ধনের মহিমা-কীর্তনে অক্লান্ত যিনি, পরিবার-

Scanned with CamScanner

নামক (সাবেকি) প্রতিষ্ঠানের আধুনিকীকরণের স্বার্থে বাসনারূপ বিষবৃক্ষের চারা ওপড়াতে, ঘরে ঘরে অমৃতফল ফলাতে যাঁর লেখনী ছিল নিড়নিবং, সেই বঙ্কিম খোদ নিজেই যে উপন্যাসে স্বরচিত তাঁর আখ্যান-চুক্তির খেলাপি হয়েছিলেন, তাই তো *কপালকুণ্ডলা*। বঙ্কিমের উপন্যাসলোকে ব্যতিক্রম নবকুমার-মৃন্ময়ীর কাহিনী -- বঙ্কিমেরই দেখাদেখি যে 'সমাপ্তিরীতি' কালে কালে বাংলা উপন্যাসের স্বভাবজাত হয়ে যাবে, তাই-ই নাকচ গেছে *কপালকুণ্ডলায়*। আর সে-জন্যই অবিস্মরণীয় হয়েছে *কপালকুণ্ডলার* অন্তিম বাক্য : "অনন্ত গঙ্গাপ্রবাহমধ্যে, বসন্তবায়ুবিক্ষিপ্ত বিচিমালায় আন্দোলিত হইতে হইতে কপালকুণ্ডলা ও নবকুমার কোথায় গেল ?" *চারুলতার* শুরুতেই, অমলের ঝোড়ো আকস্মিক প্রবেশের অনেক আগেই, জেগেছে অমীমাংসিত আন্দোলনের ঢেউ, লেগেছে ইশারা, অমৃতফল প্রত্যাশার মধ্যেই কি ছিল না নষ্টনীড়ের আভাস ? এবং এরপর কি *সধবার একাদশী*-তে নিমচাঁদের "পরিণয়-নিবারণী সভা" প্রতিষ্ঠার প্রস্তাবকে মাতালের ভাঁড়ামি, খেলো রসিকতা বলে উড়িয়ে দেওয়া সমীচীন ?

সত্যজিৎ রায়ের যে ছবির আলোচ্য বিষয়ই 'স্মৃতি', সেটি, গুপী *গাইন বাঘা বাইন*-এর (১৯৬৯) ঠিক পরের ছবি – রাজনৈতিক ওলটপালটের সময় নির্মিত, মেজাজে urbane, নাগরিকতায় নির্ভীক, ১৯৭০-এর অরণ্যের দিনরাত্রি।

স্মৃতির অরণ্যে

এর নাম ওকে, ওর নাম তাকে – প্রথমটায় চার যুবকের নাম-ডাকাডাকিতে গোলমালের একশেষ করেন মিসেস ত্রিপাঠী। অসীমকে সঞ্জয়, সঞ্জয়কে শেখর - সদ্য-পরিচিত যুবকদের নামগুলো তখনও তাঁর ধাতসহা হয়নি। মিসেস ত্রিপাঠীর স্মরণশক্তির দীনতায় কে যে কোনজন গুলোয় সব। যেন বা – সফলকাম, উচ্চাভিলাষী, ঈষৎ আত্মম্ভরী অসীম কিংবা বহুদিন-মৃত, অখ্যাত এক সাহিত্য-পত্রিকার একদা সম্পাদক, মৃদুভাষী সঞ্জয় কিংবা প্রেমে সদ্য চোট-খাওয়া ক্রিকেটার, বিষাদ-বিপন্ন হরি কিংবা বন্ধুদের দাতব্যে নির্ভরশীল, চাকরি-শূন্য, কপর্দকহীন স্বভাব-কমেডিয়ান শেখর – চারজনেরই নাম-পরিচিতি ক্ষণিকের জন্য উহ্য-স্থগিত হয়ে যায়। এরপর, মিসেস ত্রিপাঠীই প্রস্তাব করেন, রেস্ট-হাউসের নিরিবিলি

Scanned with CamScanner

বাগানে, গড়িয়ে-চলা আলতো দুপুরটা একটা খেলা খেলে কাটিয়ে নেওয়া যাক। কিন্তু আবার সেই বিস্মরণ ! মিসেস ত্রিপাঠী বিশেষ সে খেলাখানির নাম কিছুতেই মনে আনতে পারেন না। সাহায্যের জন্যে ফেরেন সঙ্গিনী রিনির দিকে – কিন্তু তাঁর ননদিনী রিনি তখন আনমনা, চোখে কালো চশমা, তাকিয়ে সে অন্য পানে। অসীম অবশ্য আঁচ করতে পারে মিসেস ত্রিপাঠী কোন্ খেলার কথা বলছেন।

খেলার নাম : memory game । নিয়ম তার : একজন কেউ প্রখ্যাত কোনো ব্যক্তির নাম দিয়ে পত্তন করবে খেলা ; পরের অংশীদার সে নামটি বলে আর এক মহাজনের নাম আওড়াবে ; এইভাবে এগোবে খেলা ; যোগে যোগে বাড়বে-ফুলবে নাম-তালিকা, কঠিন থেকে কঠিনতর হবে পারম্পর্যের শৃঙ্খলা বহাল রাখা ; নামছুট হলেই, গোলমাল পাকালেই শৃঙ্খলায়, Out – নষ্ট, এলোমেলো করলেই নামস্থাপত্য, বহিষ্কার, অংশীদার ঝরতে ঝরতে, শেষ যে প্রথম থেকে শেষ আবৃত্তি করবে নামাবলি, অক্ষত অটুট রাখবে পরম্পরার গ্রন্থি, রক্ষা করবে ঐকতান, সে-ই জয়ী।

পরিস্থিতি সত্যি চমকদার – শ্লেষের প্রচুর রসদ মজুত *অরণ্যের দিনরাত্রি*র স্মৃতি-আমোদিত এ দৃশ্য-দুপুরে। সাল ১৯৭০ – সমাগত সত্তর দশক, মুক্তির দশক। এসেছে কলকাতার চার যুবক সাঁওতাল পরগণায় বিশেষ এক উদ্দেশ্যে। নিজেদের থেকে নিজেদের মুক্তি দিতেই অসীম-শেখর-হরি-সঞ্জয়ের সাময়িক এ স্বেচ্ছা-বনবাস – সামাজিক পরিচ্ছদ, আঁটোসাঁটো নাম-শাসনের যত যা বেড়ি সমস্ত খুলে, দেদার উলঙ্গ, বন্য হওয়ার অভিলাষ তাদের। আসার পথে, গাড়িতে, সঞ্জয় পাঠ করে শুনিয়েছে, বঙ্গদর্শনে প্রথম প্রকাশিত (১৮৮০-৮২) সঞ্জীবচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়ের সাঁওতাল পরগণায় ভ্রমণের বিখ্যাত আলেখ্য, *পালামৌ*। অরণ্যের দিকে যত এগিয়েছে তারা, ততই আরো *পালামৌ*-এর প্রবাদ-বাক্য "বন্যেরা বনে সুন্দর, শিশুরা মাতৃক্রোড়ে" গভীরে ভর করেছে তাদের চৈতন্যে, দিয়েছে চাপ তাদের অবচেতনকে। চার শহুরে যুবকের অন্তর্গত রক্তের ভিতরে চলছে এখন আদিমতার আবিষ্ক্রিয়া। (অসহায় চৌকিদারকে টাকা খাইয়ে সরকারি পান্থনিবাস জবরদখলপূর্বক), একে একে সরিয়ে নিচ্ছে তারা মস্তিষ্ককোষে সঞ্চিত যত স্মৃতির পলেস্তরা। পৌঁছনোর পরদিনই (চির-জোকার)শেখর 'স্টেটস্ম্যান' কাগজ পুড়িয়ে ঘোষণা করেছে, 'এতদ্বারা সভ্যতার সহিত সকল সম্পর্ক ছিন্ন হইল' ("All links with

Scanned with CamScanner

Civilizaiton [are] hereby severed") শ্লোগান-জোকার ছাড়ার ভঙ্গিতে, মুখের কাছে আঙুলে-গোল গহ্বর থেকে হেঁকেছে শেখর : 'সক্কলে হিপি' ("All hippies")।

বুনো আদিমতায় মগ্ন হওয়ার, নিঃশ্রেয়স প্রকৃতির সঙ্গে একাত্ম হওয়ার এ যত্নসাধনায় স্বাভাবিক যে মধ্যবিত্ত পুরুষদের শরীরেও জাগৃত হবে (অসংশোধিত, অযত্নসাধিত) সনাতন পৌরুষ। তারা কি আর এমনি এমনি দাড়ি-গোঁফ না কামাবার সিদ্ধান্ত নিয়েছে – তারা যে জঙ্গলে বেমানান বলে ক্ষুর-ব্লেড তুলে রেখেছে, ভব্য-সভ্যতার জ্ঞাপক নিত্য যে কর্ম, সেই ক্ষৌরকর্মে দিচ্ছে কামাই, তা কি ব্যর্থ যাবে – পাবে না তারা অরণ্যগহনে রোমাঞ্চময় কোনো নারীর, দিক-ভোলানো কুহকিনীর সন্ধান – "জাগিবার জানিবার" গাঢ় বেদনা থেকে উত্তীর্ণ হয়ে দেবে না ডুব তারা বিস্মরণের অন্ধকারে, মরণসুখতুল্য রমণ-অতলে ? হায় ! এমনই কপাল, কোথায় লজ্জাভূষণবিরল, আদিম সরলা বালা, বেমক্কা একদিন চার যুবক পড়ে গেল দুই অতি-সভ্য বাঙালিনির নয়নপথে। তবে, আচারে-ব্যাভারে প্রখর উন্নত হলেও, সেই দু-নারীও – মিসেস ত্রিপাঠী ও রিনি – কম আকর্ষক নয়। অমোঘ তাদের আকর্ষণেই তো, বিস্মরণ ব্যাকুল কলকাতার চার যুবক, (ইচ্ছের বিরুদ্ধেই) বাধ্য হয় স্মৃতি-জাগানে খেলা memory game এ অংশ নিতে।

খেলার নিয়ম-কানুন গোড়ায় ঠিক বোধগম্য হয় না হরির। হতেও পারে, গগলস্-পরিহিতা, কেশসংস্কারে অতি-আধুনিকা রিনি rules of the game সবিশদ করে বলেই, বিহ্বলতার ধোঁকা, ধোঁয়াশা-মতো সৃষ্টি হয় খেলোয়াড়ের মগজে। এখনও যে তার অন্তরে দগদগে তাজা আছে ঘা – জনৈক কলকাত্তাই কেশবিলাসিনীর দ্বিচারিতায় প্রচণ্ড নাড়া খেয়েই তো চলছে তার বর্তমান বিষাদযোগ। কেশবতী সে রূপসীকন্যার রেশমি কালো চুল যে আদতে বাজার-খরিদ পরচুলা, আবিষ্কারের এ ধাক্কাতেই যে ভেঙে চুরমার, জেরবার দশা হরির – আরণ্যক-এ trip তো তারই খাতিরে, তার হৃদয়ক্ষতের শুশ্রূষার জন্যেই তো বন্ধুরা তাকে ধরে বেঁধে এনেছে সভ্যতার প্রান্তভূমি, কোল-সাঁওতালের পরগণায়, আধো-আচ্ছন্ন হরিকে খেলার আইন-পত্র সমঝে দিতে সাহায্যের হাত বাড়ায় (জাত-পরোপকারী) শেখর। তিনখানি দৃষ্টান্ত সহকারে হরির অস্পষ্টতা কাটাবার চেষ্টা করে সে। আর, (খেলাচ্ছলেই) পর পর যে তিনটি নাম উচ্চারণ করে শেখর, সম্মেলিত তাদের আভা-aura-ই

Scanned with CamScanner

বাকি খেলার প্রাক-প্রচ্ছদ হয়ে দাঁড়ায়। আদিবাসীদের ভূমে, পান্থনিবাসের কুঞ্জে, ১৯৭০-এর দিনদুপুরে, তিন সেই মহাপুরুষের অপ্রত্যাশিত স্মৃতি-উদ্ভাস যেন পরবর্তী নামোচ্চারণের frame। আজাদি-স্বাধীনতার সংগ্রাম ও স্বনির্ভর রাষ্ট্র গঠনসংকল্পের সঙ্গে অবিচ্ছেদ্য তাঁরা – রাষ্ট্রিক বিপর্যয়ের লগ্নে, দীর্ঘ, দীর্ঘতর হবে তাঁদের ছায়া, এ তো একরকম প্রত্যাশিতই। Memory gameটি যে এলেবেলে হবে না, না চাইলেও চার যুবকের চেতন-অবচেতন থেকে উদ্গত হবে দেশকালে প্রাসঙ্গিক বহু নাম, অলস রোমন্থন নয়, খেলাটি ক্রমশ serious, স্মৃতি সংস্কৃতির ক্ষেত্রবিশেষ হয়ে উঠবে – হরিকে দেওয়া শেখরের আদিপাঠে এরই যেন পূর্বাভাস। শেখরের দৃষ্টান্তগুলি ছিল : "গান্ধি ; গান্ধি-নেহেরু ; গান্ধি-নেহেরু-আজাদ"। সরকারিভাবে memory game-এর গোড়াপত্তন করেন মিসেস ত্রিপাঠী। এক ছেলের মা তিনি আত্ম-নিহত স্বামীর বিধবা। ভেতরে যতই সঞ্চিত থাক অচরিতার্থতার ব্যথা, বাহ্যত তিনি খুবই হাসিখুশি, খুবই উচ্ছল – অতীব পরিশীলিত মিসেস ত্রিপাঠী, বাগভঙ্গি-অসন-বসন-সাজঅলংকার, সবই তাঁর অতীব মার্জিত। গভীরতর যাই অ-সুখ থাক, নেই তাঁর বিত্তের কিংবা cultural capital বা সাংস্কৃতিক পুঁজির অসদ্ভাব। আশ্চর্যের কী অতএব, প্রথম যে নামটি মনে পড়ে মিসেস ত্রিপাঠীর, তা হল "রবীন্দ্রনাথ"। রবীন্দ্রনাথকে দিয়েই সূত্রপাত হয় চার tourist নাগরিক ও সাময়িকভাবে বনবাসিনী বিদুষী দুই মহিলার স্মৃতি-ভ্রমণ। কিন্তু আবার, রবীন্দ্রনাথের প্রতি শ্রদ্ধা-সম্ভ্রম যেমন, তেমনি হেলা-তাচ্ছিল্যের ভাবটিও (অতি-) শিক্ষিত বাঙালির হাড়ে মজ্জায় মিসে – রবীন্দ্রনাথের সঙ্গে সাহিত্য-পরায়ণ বাঙালির প্রায় এক শতাব্দীকাল লম্বা love-hate সম্বন্ধ, উপেক্ষা-মিশ্র ভালোবাসা ও ভালোবাসা-মিশ্র উপেক্ষার (পরিবর্তনমান) সে গল্প, বাংলার সাহিত্য-ইতিহাসের উপাদান নয় শুধু, (অন্তত, এখনও পর্যন্ত, যেকোনো সময়ে) হালের 'বাঙালি' মর্জি-মেজাজ বুঝতে, সবচাইতে কার্যকর, সংবেদনশীল কল-ও। আশ্চর্যের কী সুতরাং, মিসেস ত্রিপাঠীর কাছ থেকে পূজ্য (জীবন-) দেবতার নামটি পেয়ে, বিগত এক সাহিত্যপত্রিকার প্রাক্তন সম্পাদক সঞ্জয়, বেশ উদ্ধত বিদ্রোহ-ভরেই গর্জে ওঠে : "কার্ল মার্কস্"।

১৯৭০ : বিশ্ব জুড়ে বাজছে পালাবদলের ঘন্টা : ভিয়েতনামে যুদ্ধ ; ফ্রান্সে ছাত্র-ক্ষোভ ; নকশালবাড়িতে কৃষক-দমন ; বাংলাদেশে গণহত্যা ; কম্যুনিস্ট

পার্টিতে ভাঙন ; নারীবাদের ক্রমউত্থান ; তত্ত্বচিন্তায় নতুন উদ্দীপন ; এবং (এতকিছুর জের সমান জোরে না পৌঁছলেও), বাংলার মহানগরী কলকাতা উত্তাল। যে দ্বন্দ্বআবহে লালিত-আলোড়িত তখন শিক্ষিত বাঙালি মন, তারই কথারূপ যেন "রবীন্দ্রনাথ-মার্কস্ "-এর (দ্বিধাবিভক্ত) জোড়-সমন্বয়। স্পষ্টতই, যে memory game-এর সূচনায় পর পর আসে রবীন্দ্রনাথ ও মার্কসের নাম, সে game, যে-সে, এলেবেলে খেল নয়।

*অরণ্যের দিনরাত্রি*র নাম-বুননে আছে সুচতুর নকশা। রথী-মহারথীদের নাম সেখানে দুই অক্ষরেখায় সাজানো। এক অক্ষে বিন্যাসের সূত্র পরিকল্প-নির্ভর paradigmatic ; অন্যত্র, অনুক্রম-নির্ভর, syntagmatic। প্রথম ক্ষেত্রে, চালিকা-প্রশ্নটি হল, 'কার সঙ্গে যায় কে' ; আর দ্বিতীয় ক্ষেত্রে, 'কার পর কে'। গ্রন্থনার জন্য paradigm দাবি করে অনুষঙ্গের সাযুজ্য (যেমন, শার্টের *সঙ্গে* প্যান্টজুতো, পাঞ্জাবির *সঙ্গে* ধুতিচাদর) আর syntagma দাবি করে পারম্পর্যের যুক্তি (যেমন, মোজার *পর* জুতো, পাঞ্জাবির *পর* চাদর)। মিসেস ত্রিপাঠীর অবদান "রবীন্দ্রনাথ" নামটিই কি ডেকে আনে না, "শেক্সপীয়র"কে – 'পূর্বে'র high art-এর কুলপ্রতিভূর paradigmatic আকর্ষণই কি অসীমকে দিয়ে বলিয়ে নেয় না, (মেকলে-প্রবর্তিত ঔপনিবেশিক শিক্ষায় জানা), 'পশ্চিমে'র high art-এর কুলপ্রতিভূ শেক্সপীয়রের নাম ?

শেক্সপীয়রের আগে অবশ্য নির্মীয়মান স্মৃতিক্ষেত্রটিতে প্রবেশ করে গেছে ক্লিওপেট্রা। "রবীন্দ্রনাথ-মার্কস্"-এর গুরুভার হরির মতো মেঠো খেলোয়াড়ের পক্ষে বড়ই দুর্বহ হবে, এ আশঙ্কাতেই হয়তো শেক্সপীয়রধন্য নায়িকাকে, খুনসুটির সেরা নটী ক্লিওপেট্রাকে, আমদানি করেছিল রিনি। এবং, (রিনি-মারফত) ক্লিওপেট্রা স্মরণপথে উদিত হয় বলেই না, ফের সেই paradigmatic প্রণোদনায়, হরি, অনেক ভেবেচিন্তে হঠাৎ ফুকরে ওঠে : "হেলেন"। তর্ক বাধে অতঃপর : ট্রয় না বম্বের, কোন্ হেলেনের কথা ভাবছে হরি। রকমসকম যা হরির, নান্দনিক রুচির মান যা ক্রিকেটারের, তাতে সন্দেহ না হয়ে যায় না বন্ধুদের, তার মানসপটে হোমার-বন্দিত সুন্দরী নয়, বরং অভ্যুদিত হয়েছে, Bollywood রঙ্গিনী, ক্যাবেরে-উর্বশী হেলেন। ঝগড়া বাধার উপক্রম হলে, রিনিই মীমাংসা করে : এ হেলেন সে হেলেন নয়, ইলিয়াডেরই হেলেন এ। ক্ষণিকের জন্যে এলেও, ভদ্রলোক-ভদ্রমহিলাদের

Scanned with CamScanner

স্মৃতিঘোষণের পালায় স্থায়ী আসন পায় না হিন্দি ছবির নর্তকী। যতই উগ্র, অপ্রতিরোধ্য হোক জনপ্রিয় সিনেমার ক্যাবেরে শিল্পীর যৌন আবেদন, যতই লিবিডো-আতুর হোক সাঁওতাল পরগণার অরণ্যে বেড়াতে-আসা চার যুবক, ব্যক্তিগত স্মৃতির জাহের-public হওয়ার, ফাঁস-প্রকাশের ঝুঁকির খেলাতেও, বেশ সতর্ক তারা। ট্রয়ের জায়গায় বম্বের হেলেন বসলে পড়ত এক মারাত্মক ছেদ, ভালোই টুটত ভব্য স্থাপত্য। রিনির ফয়সালায় তাই শেক্সপীয়রের ক্লিওপেট্রা ও হোমারের হেলেনেই যোগ স্থাপিত হয়। জনচিত্তকল্লোলিনী হেলেনের সঙ্গে ক্লিওপেট্রার নাম যুক্ত হলে তৈরি হত অন্য কিসিমের paradigm, আরোই উদ্দ্য হতো *Antony and Cleopatra* ট্রাজেডির নায়িকার যৌন-উপস্থিতি। তবু, এতেও কম সর্বনাশের ইন্ধন নেই। কিংবদন্তির ভাঁড়ার, হোমারের মহাকাব্য কিংবা গ্রীকদের ধ্রুপদী ট্রাজেডি, সর্বত্রই আছে প্রমাণ, হেলেনের রূপানলে শুধু ট্রয় নয়, গ্রীক রাজন্যবর্গ-সহ গ্রীসদেশের বিভিন্ন কৌমসমাজ জ্বলে-পুড়ে মরেছিল। আর, মিশর-রানি ক্লিওপেট্রার সৌন্দর্যবিলাসে যে রোমক রাষ্ট্রের অছিরাও প্রমাদ গনেছিলেন, নড়েই যাচ্ছিল রোম সাম্রাজ্যের ভিত, তার প্রমাণ অমর-অম্লান আছে শেক্সপীয়রের নাটকে, আছে আবার ঐতিহাসিক প্লুটার্ক-বিরচিত *The Lives* এ। রিনির পরিকল্পে অন্বয়ের যে বিধান, তাতে 'নারী' এল রাষ্ট্রিক বিপত্তির জট হিসেবে — বজ্রগর্ভ সময়ের চার পুরুষ, অসীম-সঞ্জয়-হরি-শেখর, কি টের পেলে সে ইশারা ?

হাসাতেই হবে যাকে, প্রতিষ্ঠিত বন্ধুদের হাসির খোরাক হতেই এসেছে যে বেকার, সেই শেখর চড়িয়ে নেয় রিনির গগলস্। কালো চশমার অনুষঙ্গে, তৎক্ষণাৎই যেন মনে আসে শেখরের, '৬৭ পর্যন্ত পশ্চিম বাংলার শাসকদল কংগ্রেসের নেপথ্য-নায়ক অতুল্য ঘোষকে। ফলত, বিচিত্র যেমন, তেমনি কৌতুকবহ হয় memory game-এর পয়লা রাউন্ডে কুড়োনো নামের সংগ্রহ :

মিসেস ত্রিপাঠী । রবীন্দ্রনাথ
সঞ্জয়। মার্কস্
রিনি। ক্লিওপেট্রা
শেখর। অতুল্য ঘোষ
হরি। হেলেন
অসীম। শেক্সপীয়র

Scanned with CamScanner

দুয়ের রাউন্ডেই মিসেস ত্রিপাঠী out। আর অবাক কাণ্ড, out হন তিনি অনুক্রমিকতার অনুরোধে, না-খোল এক syntagmatic chain এ বাঁধা পড়ে। "অতুল্য ঘোষে"র বদলে ভুল করে বলেন তিনি "প্রফুল্ল সেন" – নেপথ্য–চালকের *পরেই* তো আসে মসনদ-রথে আসীন রথী। মোটে ৩ বছর হয়েছে, '৬৭-র সাধারণ নির্বাচনে, বরবাদ গেছে অতুল্য ঘোষ-প্রফুল্ল সেনের নেতৃত্ব, মহা ডোবান ডুবেছে কংগ্রেসের (শতছিদ্র) তরণী। সন্দেহ কী সুতরাং, মিসেস ত্রিপাঠীর স্মৃতিপ্রমাদের পেছনে শুধু 'অতুল্য'-'প্রফুল্ল'-এর মধ্যেকার ধ্বনিগত মিলটাই নেই, আছে এক ঐতিহাসিক জানা বোঝাও, এটা টের পেতে কোনোই অসুবিধে হয়নি memory game–এর অংশীদারদের।

তিনের রাউন্ডে বাদ যায় সঞ্জয়। প্রথম দু-রাউন্ডে অনুক্রমিকতার যে সুতো সে পাকায় তা আর টানতে পারে না। পয়লা দফায়, "কার্ল মার্কস্", দ্বিতীয় দফায় বলেছিল সে "মাও সে তুং"। মার্কসের *পর* মাও, মাও-এর *পর* কে ? ১৯৭০-এর *অরণ্যের দিনরাত্রিতে* উচ্চারিত এ প্রশ্নের জবাব কি আজও মিলেছে ?

অরণ্যের দিনরাত্রিতে যা উপস্থাপিত হয়, তা হল, *প্রক্রিয়া* — পুঞ্জনামের সাধারণ ফিরিস্তি থেকে কোন্ তরিকায়, পারিপার্শ্বিক কোন্ তাগিদে, নির্বাচিত ও অন্বিত হয় নামসমূহ, গোটা সে *ঘটনারই* dynamic, জাগর বিবরণ। 'স্মৃতি' তাই অমার রন্ধ্রে পুঞ্জিত মৃত মাধুরীর কণা নয় সেখানে, নির্ভার অতীতচারণার উপলক্ষ নয়। Memory Game–এ স্মৃতিকে 'সংগঠিত' হতে দেখি আমরা, পাই তাকে, রণ-রক্ত-সফলতার, স্বপ্ন-আশা-মর্মপীড়ার জায়মানতায় — বর্তমানের ঘটমানতায়, 'nowness'-এর তাৎক্ষণিকতায় গ্রন্থিত ওই নামমালা। মিসেস ত্রিপাঠী যেভাবে 'শেক্সপীয়ার' শব্দটিকে স্পষ্ট দু-syllable এ ভাগ করে প্রথম syllable এর ওপর আলতো, বাড়তি চাপ দেন, অথবা, (হরিকে মনে রেখে, রিনির সংযোজন) "ব্র্যাডম্যান" নামটি তিনের রাউন্ডে সঞ্জয় ভুলে গেলে "ব্র্যাডম্যান"-এর "ম্যান" অংশটিতে যে-সুরে তিনি দোল-প্রলম্বন জোগান, অথবা out হওয়ার পর (Hollywood film 'Cleopatra'-র cut-out-মাফিক) যে-ভঙ্গিতে এলিয়ে দেন নিজেকে, এদের কোনোটাই অবস্থান-নিরপেক্ষ, নৈর্ব্যক্তিক ব্যাপার নয়।

Scanned with CamScanner

১৮৪৫-৪৬ তে ইতিহাসচেতনায় ভাবাত্মার প্রাধান্য-প্রতিষ্ঠা, "hegemony of the spirit in history" বিষয়ে সাবধান করে দিয়েছিলেন মার্কস্ ; নিমর্নন নামার্চণাই যে মতাদর্শ বিস্তারের মোক্ষম কল, সে-সম্পর্কে বিস্তারিত আলোচনা করেছিলেন *The German Ideology*-তে। ১৯৬৬-র বসন্তে *Tel Quel* পত্রিকায় প্রকাশিত 'Freud and the Scene of Writing' প্রবন্ধে (ইংরেজিতে অনুদিত শিরোনাম ; দ্র ঃ *Writing and Difference*) লিখেছিলেন দেরিদা, যে বয়ান-সীমায় কিছুতেই কুলোয় না, কেবলই পিছলে ফসকে যায় স্মৃতি, তারই আভিধানিক আখ্যা 'স্বভাববাদ' ([memory] escapes the grasp of "naturalism") ; ১৯৯৩/৯৪-এর *Spectres of Marx*-এ ব্যাখ্যা দেন মার্কস্, ভূতগ্রস্ততাই স্বভাববাদ, উপস্থাপনার 'হয়ে-ওঠা'র (নানা বিরোধে পরিকীর্ণ) কাহিনীকে ভুলে গেলেই 'সঙ্গত' 'স্বাভাবিক' ঠেকে সমস্ত ("belief in the ghost in general, consists in autonomizing a representation and forgetting its genesis as well as its real grounding")। স্মৃতি নিয়ে 'বিস্মৃতি'র এ বিভ্রম যে অন্তত ১৯৭০-এ নির্মিত *অরণ্যের দিনরাত্রিতে* নেই, তা জোর দিয়েই বলা যায়। কিন্তু, সত্যজিৎ রায়ের শেষ ছবি *আগন্তুকে* ? সেখানে কি *দেবী-চারুলতা-অরণ্যের দিনরাত্রির* নির্মাতা, উলটো কাণ্ডই করেননি, জগদ্দল পাথরের মতো চাপিয়ে দেননি একগাদা নামের বোঝা ?

আগন্তুকের একতরফা বক্তা : *Twenty Thousand Leagues Under the Sea*-র ঘরহীন, দেশহীন, খাপছাড়া কাপ্তেন Nemo ('No-One' : 'কেউ-না') প্রতিম, পেশাদার নৃতাত্ত্বিক মনোমোহন। তাঁর কাছ থেকেও পাই আমরা লম্বা এক নামফর্দ। যাঁরা তাঁকে ঘর ভুলিয়েছে, গড়পড়তাদের থেকে আলাদা করে বানিয়েছে বেখাপ এক মানুষ, ঠেলে দিয়েছে নিরুদ্দেশ যাত্রায়, সেই সব অতিমানবদের কতিপয় হলেন : শেক্সপীয়র, বঙ্কিমচন্দ্র, মাইকেল মধুসূদন দত্ত, কার্ল মার্কস্, সিগমুন্ড ফ্রয়েড এবং অতি অবশ্যই রবীন্দ্রনাথ। আধেয়-বিচারে এ নামতালিকার সঙ্গে *অরণ্যের দিনরাত্রির* মৌলিক কোনো প্রভেদ নেই। কিন্তু রূপায়ণে আছে আকাশ-পাতাল তফাত। গড়ে ওঠার গল্পটাই মার গেছে *আগন্তুকে*। নাম, কেবলই জমে নাম – একের পর আসে আর এক – স্তূপীকৃত হয় মহিমাদীপ্ত, ব্যক্তিত্বে প্রখর

Scanned with CamScanner

সব মহামানবের নাম। আর আমরা হই অভিভূত – শংকর-প্রণীত, বাঙালি মধ্যবিত্তের চিরপ্রিয় উপন্যাস *চৌরঙ্গী*তে (১৯৬০) যেমন অনর্গল নামকীর্তন শুনতে শুনতে ঘোর লাগে আমাদের, চিত্তে জাগে ভক্তিবিহ্বলতা, তেমনি *আগন্তুকে*ও আধুনিকতার প্রাণপুরুষদের তথা বঙ্গীয় 'রেনেসাঁস' সম্পর্কে আমাদের মতো শাদামাটা মানুষদের প্রাণে তৈরি হয় ইতিহাস-ঊর্দ্ধ সম্ভ্রমবোধ।

আপাতত অতএব, শেষ কথা এই : সচেতন অভিপ্রায়ে, রঙ্গকৌতুকের প্রণোদনায় 'স্মৃতি'কে জাগরুক করার মস্ত কারিগর যেমন সত্যজিৎ রায়, তেমনি নীতিশাসনের বেড়ি পরিয়ে 'বিস্মৃতি'র অবশ আলস্যে মানুষকে ভক্তি-শ্লথ করার কৃৎশিল্পীও - (অবশ্য, এ স্ববিরোধ কোন্-না সৃষ্টিশীল ব্যক্তির নেই ?)



প্রবন্ধের প্রথম খসড়া : 'বীক্ষণ' আয়োজিত প্রথম সুরঞ্জন স্মারক বক্তৃতা, ২০০২, 'গীতাঞ্জলি', বোলপুর।

Scanned with CamScanner

হিন্দুস্থানী সঙ্গীতের সেকাল ও একাল

তীর্থংকর রায়

তিন যুগ

হিন্দুস্থানী সঙ্গীতের ইতিহাসে গত দুশো বছরে একটা সামাজিক-অর্থনৈতিক বিপ্লব ঘটে গেছে, যার প্রভাবে গান শোনা, গানের উপাদান, গানের চর্চা, অনেকটাই বদলে গেছে। এই বদল এখনো হয়ে চলেছে। তাই বর্তমানকে বোঝার জন্যে, আরো বেশি ভবিষ্যৎকে বোঝার জন্যে, ইতিহাসে ফিরে যাওয়া প্রয়োজন।

যদিও শাস্ত্রীয় সঙ্গীতের একটা প্রাক্‌মোগল রূপের কথা আমরা জানতে পারি কিছু সংস্কৃত পুঁথি থেকে, এই সঙ্গীতের যে চেহারার সঙ্গে আধুনিক যুগের পরিচয়, তা প্রায় পুরোপুরি উত্তর ভারতের 'ইন্ডো-ইসলামিক' সংস্কৃতির সৃষ্ট ঐতিহ্য। এই ঐতিহ্যের সঙ্গে হিন্দু শাস্ত্রীয় ঐতিহ্যের সম্পর্ক ঠিক করা এখন অসম্ভব।

বিপ্লবের শুরু অষ্টাদশ শতাব্দীর শেষ, উনবিংশ শতাব্দীর প্রথম দিকে, যখন দিল্লী-আগ্রা-লাহোরের মুসলমান সভা-গায়কেরা এককভাবে বা সদলে পাঞ্জাব ও পশ্চিম উত্তরপ্রদেশে তাঁদের ভিটেমাটি ছেড়ে দক্ষিণে-পুবে-পশ্চিমে যাত্রা করেন রোজগারের সন্ধানে। নতুন ঠিকানায় - গোয়ালিয়র, জয়পুর, কাশী, মিরাজ, কোল্‌হাপুর, ইন্দোর, বরোদা, ঢাকা, বা গয়ায় - তাঁদের 'সভাগায়ক' পরিচয় অক্ষুণ্ণ ছিল। তবে এঁদের অনেককেই নিশ্চয়ই পরিবেশের বদলের সঙ্গে কষ্ট করে মানাতে হয়েছে, যে ইতিহাস আমাদের কাছে অজ্ঞাত। এইসব রাজ্যে নবলব্ধ আভিজাত্য, রাজধানীর বিশেষত্ব, প্রতিষ্ঠা করার জন্যে যেসব সাংস্কৃতিক প্রতীকের ব্যবহার হত, তার মধ্যে গান ছিল প্রধান। তবে একমাত্র নয়। গায়ক ছাড়াও এসব শহরে নিয়ে আসা হয় ওস্তাদ কারিগরদের, যাঁরা তৈরি করতেন কারুকার্য করা পাথরের প্রাসাদ বা মন্দির, গালিচা, মলমলের জামদানী, বা খোদাই করা কাঠের আসবাবপত্র। বস্তুত 'ওস্তাদ' কথাটার জন্ম সূক্ষ্ম কারিগরীর ইতিহাসে, গানে নয়, সেই ইতিহাসে পরে ফিরে আসব। কিংবদন্তী শুনে মনে হয় গায়ক-ওস্তাদদের অনেকে আগ্রা থেকে সঙ্গে নিয়ে এসেছিলেন মোগলাই মেজাজ। এঁদের জগৎ ছিল দরবারের সাধারণ শিক্ষিত কর্মচারীদের নাগালের বাইরে।

Scanned with CamScanner

উনবিংশ শতকের শেষ পঁচিশ-ত্রিশ বছরে, বিপ্লবের দ্বিতীয় অধ্যায়ে, সেই দূরত্ব অনেকটা কাটল। এই সময় থেকে সভাগায়কদের সংখ্যাও যেমন বাড়ল, তেমনই এঁদের ভূমিকাও কিছু বদলে গেল। এই পরিবর্তনের একদিকে আছে গান শোনার ইতিহাসে সবথেকে বড়ো ঘটনা - গানের রূপান্তরণ প্রতীকী ভোগবস্তু থেকে রসে, জাহির করার জিনিস থেকে ভালবাসার জিনিসে। এই পরিবর্তনের সাথে সাথেই সঙ্গীত আর কারিগরী শিল্পের রাস্তা আলাদা হতে থাকে। অন্যদিকে, রাজকর্মচারী এমন কি রাজাদের পরিবারেও অনেকে ওস্তাদদের শিষ্য হলেন। পরবর্তী প্রজন্মে যাঁরা গানকে দরবার থেকে জনতার কাছে পৌঁছে দেওয়ার কাজে বড়ো ভূমিকা নেন, তাঁদের গানের শিক্ষা ওস্তাদদের থেকে বেশি এইসব মধ্যস্থ গুরুদের কাছে, যাঁদের অনেকেই ছিলেন ব্রাহ্মণ। মহারাষ্ট্রে এই প্রবণতার সবথেকে গুরুত্বপূর্ণ প্রতিনিধি ছিলেন বালকৃষ্ণবুয়া ইচলকরঞ্জিকর (১৮৪৯-১৯২৬)। মনে হয় বাংলার জমিদারিগুলিতে এই মধ্যস্থ গুরুদের ভূমিকা পশ্চিম ভারতের তুলনায় কিছুটা সংকীর্ণ ছিল, এবং তাঁদের সংখ্যাও ছিল কম।

উনিশ শতকের পশ্চিম ভারতে গোয়ালিয়র রাজসভার হদ্দু খাঁ (মৃ- ১৮৫০) ও হসসু খাঁ (মৃ- ১৮৭৫), যাঁদের পূর্বপূরুষরা এসেছিলেন পাঞ্জাব থেকে, বরোদা রাজের গায়ক মওলা বক্স (১৮৩৩-৯৬) ও সমসাময়িক ফয়েজ মহম্মদ খাঁ, মোরাদাবাদের কিছু গায়ক যাঁরা পরে বোম্বাইতে ভেণ্ডিবাজার ঘরানা নামে পরিচিত হন - মুসলমান-হিন্দু পাত্রান্তরণে বড়ো ভূমিকা নিয়েছিলেন, সবসময়ে ইচ্ছাকৃত নয়। পূর্ব ভারতে এই কাজে পথিকৃৎ ছিলেন রামপুরের সভাবাদক ওয়াজির খাঁ (১৮৬১-১৯২৬) ও ইটাওয়া থেকে আসা সেতারী ইমদাদ খাঁ (১৮৪৮ - ১৯২০)। বিশ শতকের প্রথমে আরো অনেক মুসলমান ওস্তাদ হিন্দুদের গান শিখিয়েছেন, তবে তখন আর ব্যাপারটা বিরল ছিল না।

উনিশ শতকের দ্বিতীয়ার্ধ রেলগাড়ির যুগ। ওস্তাদদের অনেকেই আগের থেকে অনেক বেশি ভ্রমণশীল। পশ্চিম উত্তরপ্রদেশের সঙ্গে তাঁদের যোগ নামে মাত্র। এদিকে খাস দরবারী চাকরির স্বর্ণযুগ শেষ হতে চলেছে। বাজারে না নামলে এবং অল্পস্বল্প প্রতিযোগিতায় যোগ না দিলে চলবে না। ওস্তাদদের একাংশ আসতে শুরু করলেন বৃটিশ ভারতের বাণিজ্যকেন্দ্রগুলিতে, কলকাতায় বা বোম্বাইতে। সেখানে ব্যবসায়ী সম্প্রদায়ের মধ্যে অনেকে তাঁদের শিষ্যত্ব নিলেন। আর জমিদার-ব্যবসায়ীদের

Scanned with CamScanner

আড্ডায়-জলসায় তাঁদের অনিয়মিত উপস্থিতি বাড়ল। 'বড়লোক' আয়োজিত জলসার ঐতিহাসিক গুরুত্ব যথেষ্ট, যদিও এইসব জলসায় সাধারণের প্রবেশাধিকার ছিল না। আমার মনে হয় জলসার প্রধান গুরুত্ব গায়কদের নিজেদের পারস্পরিক পরিচয় আর আদানপ্রদানের সুযোগ বাড়ানোয়। এই যোগাযোগের একটা ভাল দিক ছিল, গানের প্রথা, কেতা, শৈলী, গায়কী, ইতিহাস নিয়ে গায়কসমাজ ও শ্রোতাসমাজের মধ্যে কৌতূহল বাড়ল, আদানপ্রদান বাড়ল।

এই যোগাযোগের যে একটা অশুভ দিকও ছিল স্বীকার না করে উপায় নেই। গায়করা, বিশেষ করে ওস্তাদসম্প্রদায়, তাঁদের জ্ঞানের ঝুলি লুকোতে শুরু করলেন। অন্তত আগের যুগের ওস্তাদদের সম্বন্ধে গোপনীয়তা আর সন্দেহবাতিকতার বদনাম বিশেষ শোনা যায় না, যতোটা শোনা যায় এই উনিশ শতকের শেষে বা বিশ শতকের প্রথম দিকের পরিবেশে। বিষ্ণুনারায়ণ ভাতখণ্ডের (১৮৬০-১৯৩৬) অমূল্য সঙ্কলন এই সন্দেহবাতিকতার পরিবেশে, ওস্তাদী মহলের তীব্র বিরোধিতার সঙ্গে যুদ্ধ করে, আপোস করে, তৈরি হয়। সে যাই হোক, দরবারী জলসার জীবন্ত একটা ছবি পাওয়া যায় গুপী গাইন বাঘা বাইন সিনেমায়, শুণ্ডীর রাজসভায়, সে অবশ্য নেহাৎ ছোটখাটো দরবার নয়।

বিপ্লবের তৃতীয় অধ্যায়ের শুরু হয়তো প্রথম বিশ্বযুদ্ধের আশেপাশে। বিশ বা ত্রিশের দশকে ওস্তাদদের সংখ্যা কমে এসেছে, এবং গানের জগতে ওস্তাদীসমাজের বাইরের লোকেদেরই ভিড় বেশি। গান এঁদের অনেকেরই পেশা নয়, অর্থাৎ ছাত্রছাত্রী খুঁজতে পকেটের জোর বিচার করার দরকার নেই। নতুন প্রজন্মদের অনেকেই ভালবেসে গান শিখলেন। কোন জিনিস ভালবেসে শিখলে তা নিয়ে মানুষের কৌতূহল বেড়ে যায়। গানের ইতিহাস লেখার সূত্রপাত এই নতুন আত্মসচেতনতা থেকেই। বাংলা এবং মহারাষ্ট্র-গোয়ায় ওস্তাদী গান নাটকের জগতে বিপ্লব এনে দেয়, যার শুরু উনিশ শতক থেকেই, কিন্তু প্রসার বিশ শতকের গোড়ায়। মহারাষ্ট্র-গোয়া ও উত্তর কর্ণাটকে ভ্রাম্যমান নাটকের দল যেমন বড়ো শিল্পী তৈরি করেছে, তেমনি সাধারণ মানুষের মধ্যে, এমন কি গ্রাম বা ছোট শহরেও, সুরবোধ পৌঁছে দিয়েছে। তুলনায়, বাংলার নাটক, ঐতিহ্য ও গানের বোধ বরাবরই অনেকটা কলকাতাকেন্দ্রিক ছিল।

যেসব গায়করা ভালবেসে গান শিখেছেন, তাঁদের অনেকে গান শিক্ষার

প্রতিষ্ঠান শুরু করলেন। পুণা ও বোম্বাই এ ব্যাপারে পথিকৃৎ। ওস্তাদের কাছে না শিখে ইস্কুলে গিয়ে গান শেখা নিয়ে ঠাট্টা করার চল ওস্তাদী সমাজ থেকে ছড়িয়ে বেশ কিছু দূর গিয়েছে। পুণায় বাস করলে গানের ইস্কুলের বিরাট ঐতিহাসিক ভূমিকা উপলব্ধি করার সুযোগ পাওয়া যায়। সাধারণ নাগরিক মধ্যবিত্ত সমাজে গান শোনার অভ্যাস তৈরি করায়, আর অনেক সময়ে প্রাথমিক শিক্ষার ভিত্তি তৈরি করায়, গানের স্কুলের দান অনেক। আরও একটা ব্যাপারে পশ্চিম ভারতের গানের স্কুলগুলি অগ্রগণ্য, এই প্রতিষ্ঠানগুলি জলসার প্রধান কেন্দ্র হয়ে ওঠে। বেতার ও গ্রামোফোনে গানের প্রচারও এই সময় থেকে শুরু। এই পাঁচটি প্রধান রাস্তা দিয়ে - ওস্তাদীসমাজ বহির্ভূত গায়ক-শিক্ষক, নাটক, গানের স্কুল, বারোয়ারী বা প্রতিষ্ঠানিক জলসা, আর যান্ত্রিক প্রচার - নাগরিক মধ্যবিত্তের শিরার ভিতরে ওস্তাদী গান গিয়ে প্রবেশ করে।

ওস্তাদ-শ্রোতা-ঐতিহাসিক সবাই মাঝে মাঝে আক্ষেপ করে থাকেন যে এই বিরাট বদলের সাথে সাথেই গানের উপাদান আর কৌশল অনেক হারিয়ে গেছে। এ রকম একটা ধারণা অনভ্যস্ত শ্রোতাদেরও কখনো মনে আসে পুরোন দিনের গান যন্ত্রে শুনলে। গায়করা আফশোস করেন যে বাজারী হওয়ার তাড়ায় শিক্ষার্থীরা তাড়াতাড়ি মাঠে নেমে পড়ে। বাজারী প্রতিযোগিতার উপরে সবটা দায় চাপিয়ে দেওয়া হয়তো ঠিক হবে না। প্রতিযোগিতা অনেক সময় মান রক্ষা করতে সাহায্য করে। পশ্চিমের শাস্ত্রীয় সঙ্গীত তো আমাদের আগে থেকে আমাদের থেকে বেশি করে বাজারী। মানতে হবে যে মান পড়ে যাওয়ার পেছনে প্রাতিষ্ঠানিক বদলের একটা ভূমিকা আছে।

সঙ্কটের সূত্রপাত : 'ঘরানা'র লোপ?[১]

কোন কোন ঐতিহাসিকের মতে 'ঘরানা'র অবলুপ্তির কারণেই অনেক দামি জ্ঞান হারিয়ে গেছে। তা হলে ঘরানা ব্যাপারটা কি একটু জানা দরকার। এঁদের মতে

---

[১] এই অংশে যে মতগুলি উল্লেখ করেছি সেগুলি নিয়ে আরো বিস্তৃত আলোচনার জন্যে দ্রষ্টব্য D. Neuman, *The Life of Music in North India*, Detroit : 1980 ; J.Kippen, The Tabla of Lucknow, Cambridge : 1988 ; J.S. Hamilton, Sitar Music of Calcutta, Delhi : 1994 ; W.Van der Meer, *Hindustani Music in the 20th Century*, The Hague : 1980 ; সুগত মার্জিত 'Transferring Personalised Knowledge : Guru's dilemma', *Economic and Political Weekly*, 1995, p.p. 1663-5.

Scanned with CamScanner

ঘরানা অর্থ প্রধানত পরিবার। পারিবারিক পরম্পরায় গানের শিক্ষা দেওয়া হত বিশেষ যত্ন করে, কারণ সেই শিক্ষাদানের সঙ্গে জুড়ে ছিল পরিবারের স্বার্থ ও সম্মান রক্ষার চেষ্টা। অর্থনৈতিক চাপে ওস্তাদদের পরিবারের বাইরে থেকে ছাত্র সংগ্রহ করতে হয়, ফলে শিক্ষার পেছনে সেই বিশেষ যত্ন যা শুধু পরিবারভুক্তদের জন্যে সংরক্ষিত তার অভাব দেখা দেয়। এ কথাও অনেকে বলেন যে এই স্মৃতিভ্রংশের জন্যে দায়ী ওস্তাদদের সন্দেহপ্রবণতা, শেখাবার অনিচ্ছা, গোপন রাখার চেষ্টা। কিন্তু কোন ভয় থেকে শিক্ষকরা জ্ঞান দান না করে লুকিয়ে রাখতে ব্যস্ত হবেন ? এর উত্তরেও কেউ কেউ পরিবারের প্রসঙ্গ তোলেন। গুরু যদি একসাথে আত্মীয় আর অনাত্মীয়কে শেখান, তা হলে পারাবারিক স্বার্থ রক্ষার জন্যে আত্মীয়কে একটু বেশি আর অনাত্মীয়কে কিছু কম শেখানো অসম্ভব নয়।

আত্মীয়-অনাত্মীয়ের বেড়া ডিঙিয়ে কেউ বলেন ঘরানা আসলে মধ্যযুগীয় ইউরোপের 'গিল্ড্' জাতীয় প্রতিষ্ঠান। গিল্ড্ ছিল একরকম ক্লাব যেখানে মোটা টাকা দিয়ে সদস্য হতে হত, বিনিময়ে সদস্যরা কিছু জটিল বিদ্যা শিখতে পারত বা দরকারি তথ্য জানতে পারত। গিল্ড্ গোপনীয়তা রক্ষার জন্যে অনেক কৌশল ব্যবহার করত ঠিকই। তবে যে বাহ্য চেহারা থাকলে গিল্ড্ শব্দটা ব্যবহার হত - আইনকানুনের কাঠামো, সরকারী স্বীকৃতি - এ সবের কিছুই আমাদের দেশে খুঁজে পাওয়া যায় না, না শিল্পের ইতিহাসে, না গানের ইতিহাসে। কোন ঐতিহাসিকের মতে ঘরানার উৎপত্তি জাতি থেকে। কোন বিশেষ জাতের মানুষ, গান যাদের পেশা, তারা নিজেদের বংশপরম্পরাকে এই নামে ডাকত। এমন জাত অবশ্য উত্তরভারতে খুঁজে পাওয়া যায় না। 'মিরাসি'-দের উল্লেখ কেউ করেন। এরা ছিল কিছুটা ভবঘুরে গাইয়ে-বাজিয়েদের দল, যাদের সঙ্গে পরবর্তীকালের কিছু সারেঙ্গী ঘরানার ক্ষীণ সম্বন্ধ থাকতেও পারে। কিন্তু এদের সামাজিক স্থান ছিল নিচুতে। আমরা যতো দূর জানি, গায়ক ওস্তাদেরা সকলেই নাগরিক ও আশরফ স্তর থেকে এসেছিলেন।

অবশ্যই পারিবারিক স্বার্থের একটা ভূমিকা ছিল সামগ্রিক স্মৃতিভ্রংশের পেছনে। কিন্তু পারাবারিক স্বার্থকে বড় করে দেখলে ইতিহাসটা একটু একপেশে হয়ে যাবে। প্রথমত, শিক্ষা পুরোপুরি বাণিজ্যিক হওয়ার আগে স্বার্থ আর শিক্ষার মধ্যে এই ধরনের বিরোধ অল্পবিস্তর অনেক বিষয়ে অনেক দেশেই নিশ্চয়ই দেখা গেছে। কিন্তু এমন কথা শোনা যায় না যে তার কারণে জ্ঞানার্জনের বিরাট ক্ষতি

Scanned with CamScanner

হয়ে গেছে। তা হলে শুধু ওস্তাদী গানের ক্ষেত্রেই এই বিরোধটা এতো বড় করে দেখব কেন ? দ্বিতীয়ত, যেখানে শিক্ষা ব্যাপারটা ব্যক্তিকেন্দ্রিক, সেখানে পারিবারিক সম্মান রক্ষার কথা ভেবে নিজের ছেলেকে বেশি শেখানো, আর শিক্ষকের আত্মসম্মান রক্ষার কথা ভেবে যোগ্য ছাত্রকে বেশি শেখানো, এ দুয়ের মধ্যে দ্বন্দ্ব থাকতে পারে। কিন্তু সব ক্ষেত্রে দ্বন্দ্বের নিষ্পত্তি হবে আত্মসম্মানের উপরে পারিবারিক সম্মানের জয়ে, এমন ধরে নেওয়ার কারণ নেই।

তা হলে জ্ঞান হারিয়ে যাওয়ার কারণ কি ? ঘরানার অবলুপ্তির সঙ্গে তার সম্পর্ক কোথায় ?

পুরোনো ওস্তাদী ঘরানার ইতিহাস পড়লে বোঝা যায় যে ঘরানা ব্যাপারটা আসলে 'পরিবার' বলতে আমরা যা বুঝি সেরকম সাদামাটা পরিবার ছিল না। প্রথমত, মুসলমান ঘরানার নামের তালিকা পড়ে দেখবেন তাতে মেয়ে নাম দুষ্প্রাপ্য। শুধু পুরুষমানুষ দিয়ে কি পরিবার হয় ? দ্বিতীয়ত, নামের তালিকা পড়ে বোঝা যায় যে এগুলি সাধারণ বংশলতিকা নয়, শিক্ষক-ছাত্র পরম্পরা, অথবা বলা যায় শিক্ষানবিশীর পরম্পরা। অনেক ক্ষেত্রে শিক্ষক-ছাত্র পরম্পরা আর রক্তের সম্পর্কের যোগ ঘটেছে, কিন্তু আবার অনেক সময় এ দুটি আলাদাও থেকেছে। মনে হয় ওস্তাদেরা ভাল ছাত্র তৈরি করা আর পরিবারের নাম রাখার মধ্যে যে একটা বিরোধ দেখা দিতে পারে তা ভাল করেই বুঝতেন। সেই বিরোধ এড়াবার কতোগুলি কৌশল ছিল। এক, ভাল ছাত্রকে মেয়ের সঙ্গে বিয়ে দিয়ে জামাই করে ফেলা। কোন কোন ক্ষেত্রে এই কৌশলটা যে একটা সূক্ষ্ম ব্ল্যাকমেইলের মতো ব্যবহার হত, তাতে সন্দেহ নেই। দুই, সন্তান ছাড়াও নিকট বা দূর সম্পর্কের ভাইপো-ভাগনেদের মধ্যে থেকে শিক্ষানবিশ যোগাড় করা। এইসব পরিবারে অনেক সময়ে জ্ঞাতি ভাইবোনের বিয়ে প্রচলিত ছিল, সে ক্ষেত্রে এই দুই কৌশলের মধ্যে তফাৎ হত সামান্য। মোট কথা গানের মান রক্ষার ব্যাপারে ওস্তাদেরা যথেষ্ট সচেতন ছিলেন, এবং সেই মান রক্ষার তাগিদে পারিবারিক সম্পর্ক স্থাপনে বেশ কিছু অদলবদল হয়।

সঙ্কটের কারণ : শিক্ষানবিশী ও প্রতিযোগিতা[২]

জ্ঞানের ইতিহাসে এবং ঘরানার ইতিহাসে পুত্রস্নেহ ব্যাপারটাকে বাড়িয়ে দেখা

[২] এই অংশের আলোচনার ভিত্তি আমার লেখা 'Music as Artisan Tradition', *Contributions to Indian Sociology*, 1998 এবং *Traditional Industry in the Economy of Colonial India*, Cambridge : 1999.

Scanned with CamScanner

হয়েছে। শিক্ষানবিশী ঐতিহ্যের একটা আলাদা গুরুত্ব আছে। সেটা বুঝতে হলে কারিগরী ইতিহাসে ফিরে যাওয়া দরকার।

গানে শিক্ষানবিশীর প্রসঙ্গ তুললে অনেকে আলগাভাবে 'গুরুশিষ্য-পরম্পরা' আওড়ান। আমরা শিক্ষানবিশীর যে ইতিহাস জানতে পারি, তার সাথে বৈদিক আশ্রম বা টোল-চতুষ্পাঠীর কোন সম্বন্ধ নেই। আছে মুসলমান আমলের শিল্পের ইতিহাসের সঙ্গে। মোগলযুগের শেষভাগে আগ্রা-দিল্লীর নাগরিক সংস্কৃতিতে গানের পাশেই হত অনেক সূক্ষ্ম হস্তশিল্পের চর্চা। এই শিল্পগুলির ইতিহাস থেকে 'ইন্ডো-ইসলামিক' ধারার শিক্ষানবিশী ঐতিহ্য সম্বন্ধে আমরা অনেক কিছু জানতে পারি। এই শিক্ষানবিশী প্রতিষ্ঠানের বড়ো বিশেষত্বগুলি গানের জগতেও খুঁজে পাওয়া যায়, যার থেকে মনে হয় যে দরবারী কালচারে গান আর হস্তশিল্পের মধ্যে মৌলিক তফাৎ ছিল না। 'উস্তাদ', 'শাগীর্দ্', 'খানদান' বা 'বিরাদরি', শব্দগুলি অপেক্ষাকৃত পুরোনো হস্তশিল্পের ধারা থেকেই গানের ধারায় এসে পৌঁছয়। এদের অর্থ এবং ওজন দুই ধারাতেই একই রকম।

যে কথাটা বিশেষ উল্লেখযোগ্য তা হল, এই দুই ধারাতেই উনিশ-বিশ শতকের মোড়ে গুণগত মান পড়ে যাওয়ার ও পুরোনো দক্ষতা হারিয়ে হাওয়ার জনশ্রুতি প্রবল হয়ে ওঠে। এটা যদি কাকতালীয় না হয়, তা হলে মানতে হয় যে শিক্ষানবিশী প্রতিষ্ঠানের সঙ্গে এই প্রবণতার সম্পর্ক ছিল। সম্পর্ক সত্যিই ছিল, এবং সেটা এই রকম। সূক্ষ্ম দক্ষতা, যার ভিত্তি বোধ, বুদ্ধি আর অভ্যাস, আজকের ভাষায় 'ইন্টেলেকচুয়াল প্রপার্টি', যার উপরে সহজে পেটেন্ট নেওয়া যায় না, অন্তত সেকালে যেত না - এদের যখন বাণিজ্যকরণ হয় তখন কিছুটা পরিমাণে জ্ঞানক্ষয় অবশ্যম্ভাবী। কারণ এ জাতীয় সৃষ্টি নকল করা খুব সহজ। নকল করতে রয়ালটি দিতে হয় না, অনেক সময়েই অনভিজ্ঞ শ্রোতারা টেরও পাবে না যে নকল হচ্ছে। নকলের হাত থেকে বাঁচবার জন্যেই গুণী শিক্ষকরা অনেক দামি জ্ঞান ছাত্রদের কাছ থেকে এবং অন্য গায়কদের কাছ থেকেও লুকিয়ে রাখতেন, বা দিতেন এমন পাত্রে যার দ্বারা মেরে দেওয়ার সম্ভাবনা কম।

একই রকম উদ্বেগ থেকে কিছু বড়ো গায়কেরা বৃদ্ধ বয়েস পর্যন্ত ছাত্রদের (নিজের ছেলেদেরও) আলাদা গাইতে না দিয়ে পাশে বসিয়ে রাখতেন। একই রকম

Scanned with CamScanner

উদ্বেগ থেকে গায়করা 'আমার নিজের সৃষ্টি' বা 'আমার ঘরের অতি পুরাতন মাল' এ জাতীয় দাবি প্রতিষ্ঠা করা নিয়ে হামেশা বাড়াবাড়ি করেন। এবং একই রকম উদ্বেগ থেকে বড়ো ওস্তাদদের ছাত্ররা আত্মঘাতী দলাদলিতে লিপ্ত হত। বিশ শতকের গোড়ায় গান শেখার ইতিহাস পড়লে দেখা যায় কি ভয়ানক সর্বব্যাপী ঈর্ষার সঙ্গে লড়াই করে অনেক বড়ো শিল্পীকে গান শিখতে হয়েছে। এই লড়াইয়ে প্রতিভার ক্ষতি হয়েছে প্রচুর। আরও বেশি, এই লড়াইয়ের তিক্ততার প্রভাব পড়েছে পরের প্রজন্মের সঙ্গীতশিক্ষার উপর। এই লড়াইয়ের দাম অপরিমেয়।

অন্যভাবে বললে, পারিবারিক স্বার্থ আর সাঙ্গীতিক মানের মধ্যে যে বিরোধের কথা আগে উল্লেখ করেছি, সেটা গোড়া থেকেই ছিল না, সেটা তৈরী হয়েছে ইন্টেলেকচুয়াল প্রপার্টি আর বাজারী প্রতিযোগিতার মধ্যে অসঙ্গতির কারণে।

এই হল ঘরানা শব্দের প্রাতিষ্ঠানিক দিকটার ইতিহাস। আমার মতে কথাটা আগে হোক পরে হোক, 'পরিবার' বোঝাত না, বোঝাত শিক্ষানবিশী, ওস্তাদ-শাগীরদ্ পরম্পরা। যে কোন শিক্ষানবিশী ঐতিহ্যেই শিল্পের বাণিজ্যকরণ হলে কিছু বিকৃতি দেখা দিতে পারে, যার চেহারা ও কারণ বললাম। তবে শিল্পের বাণিজ্যকরণ হলে শিক্ষানবিশী ঐতিহ্য অন্যদিকে আরও বলিষ্ঠও হয়ে উঠতে পারে। দুই ধরনের বল, দুয়েরই উৎস উনিশ-বিশ শতকের ক্রমবর্দ্ধমান গানের বাজার, বিশেষ উল্লেখযোগ্য। এক, মেয়েদের গান শিক্ষা। দুই, গায়কীর বিবর্তন।

বেড়া ভাঙ্গার ইতিহাস

যে মুসলমান শিক্ষানবিশী ঐতিহ্য বা ওস্তাদ-শাগীর্দ্ পরম্পরা পশ্চিম উত্তরপ্রদেশ থেকে ক্রমে অন্যত্র ছাড়িয়েছে, এবং যে ধারা উনিশ শতকের শেষ থেকেই আত্মীয়স্বজন আর গোষ্ঠীর বাইরে থেকে শিক্ষানবিশ নেওয়া শুরু করেছে, সেই ঐতিহ্যে মেয়েদের গান শেখার রেওয়াজ ছিল না। একেবারে ছিল না বললে ভুল হবে, তবে অত্যন্ত বিরল ছিল। গান শেখানোর বা সাধারণে শোনানোর উল্লেখ নেই বললেই হয়। ঠুংরী জাতের প্রান্তীয় ধারাকে বাদ দিয়ে বলছি। ওস্তাদ-শাগীর্দ্ পরম্পরায় মেয়েদের অনুপস্থিতি গানের ক্ষেত্রেও যেমন দেখা যায়, সূক্ষ্ম কারিগরীর ইতিহাসেও তেমনি দেখা যায়। এটাও দুয়ের বড়ো মিল, আর দুয়ের ঐতিহাসিক যোগসূত্রের পরিচায়ক। আমার বিশ্বাস, আজকের দিনে মুসলমান গায়ক-বাদক

Scanned with CamScanner

পরিবারগুলি যে প্রায় বিলুপ্ত হয়ে গেছে তার একটা বড়ো কারণ মুসলমান মেয়েদের গানের জগৎ থেকে সরিয়ে রাখা।

যখন থেকে মুসলমান ওস্তাদেরা হিন্দু শাগীর্‌দ্‌ নেওয়া শুরু করলেন, তখন থেকে মেয়েদের প্রবেশ বাড়তে থাকল। উনিশ শতক হিন্দু মেয়েদের জন্যেও খুব উদার যুগ ছিল না। তবে অন্তত মহারাষ্ট্র-গোয়া অঞ্চলে বিশ শতকের প্রথম দিকে গান শেখা এবং শেখানোর ব্যাপারে পুরুষদের থেকে মেয়েরা খুব পিছিয়ে থাকে নি। বাংলায় গানের জগতে মেয়েদের প্রবেশ তুলনায় আরো পরে ও আরও ছোট মাপে। পর্দার কড়াকড়ি পশ্চিমের সমাজে ছিল কম, এবং মহিলা পথিকৃৎদের অন্তত কয়েকজন গানের জগতে আসতে পেরেছিলেন নাটকে মেয়ে অভিনেত্রীদের রাস্তা খোলা ছিল বলে। আজকের দিনে যারা মহারাষ্ট্রের বিশিষ্ট গায়কগায়িকা, এদের অনেকেই মহিলা, বা এদের 'গুরু' মহিলা। এই গুরুদের মধ্যে অনেকেই গত। যাঁরা সহস্রাব্দ পেরিয়ে এসেছেন তাঁদের মধ্যে উল্লেখযোগ্য নাম মুম্বইবাসী মোগুবাই কুর্দিকার (১৯০৭-২০০১), ও পুণাবসী সরস্বতীবাই রাণে (১৯১৮-) এবং গঙ্গুবাই হাঙ্গল (১৯১৮-)। তিনজনেই বিশ শতকের মাঝামাঝি থেকে গানের জগতের কেন্দ্রস্থ মহিলা ব্যক্তিত্ব। আমাদের প্রজন্মের যারা এঁদের দেখেছে, তারা মূর্তিমতী ইতিহাসের সাক্ষাতে এসে ধন্য হয়ে গেছে।

মেয়েদের গান শেখা বা শেখানোর ঐতিহাসিক গুরুত্ব অপরিসীম। আমাদের সমাজে, হিন্দুই বলুন আর মুসলমানই বলুন, খুব সম্প্রতিকাল পর্যন্ত পুরুষ-গুরুর মেয়ে-শিষ্য ব্যাপারটা নিয়ে হাজার খুঁতখুঁতির সৃষ্টি হত। গুরু যদি সুপুরুষ হয়, বিবাহিত হোক বা না হোক, আর দেখতে হবে না। আমার আন্দাজ মহারাষ্ট্রে এ জাতীয় বিকারের কারণ কম ঘটেছে বাংলার তুলনায়। সে যাই হোক। এ রকম সামাজিক পরিস্থিতিতে মেয়েদের গান শেখার সুযোগ অনেক বেড়েছে মেয়েরা শেখানো শুরু করার পর থেকে। মেয়েদের গলায় কতোগুলি বিশেষ ভাব বা বিশেষ রাগের চর্চা ভাল করে হয়, এ কথা হয়তো অনেকে মানবেন। না মানলেও, এটা স্বীকার করতেই হয় যে এই বিপ্লবের কারণে গানের শ্রোতা-সমঝদার-শিল্পী-শিক্ষক-ছাত্র সমাজে বিরাট ব্যাপ্তি ঘটেছে, যার থেকে মুসলমান আমলের গান, তার আর যা মাহাত্ম্যই থাক একেবারে বঞ্চিত ছিল। এই বিপ্লবের সঙ্গে জুড়ে আছে শিক্ষানবিশীর চরিত্র বদল, যে ইতিহাস খুব বেশি দিনের পুরোনো নয়।

Scanned with CamScanner

বাজারীকরণ ও প্রাতিষ্ঠানিক বদলের দ্বিতীয় বড়ো দান গায়কীর বিবর্তন। বিশ শতকের দ্বিতীয়ার্ধে ঘরানার নামের সঙ্গে গান গাইবার বিশেষ রীতি জুড়ে গেছে, যথা 'কিরানা', 'অত্রৌলি', ইত্যাদি। যদিও ঘরানা শব্দটা পুরোনো, এই রীতিগুলির ইতিহাস খুব পুরোনো নয়। অনেকে মনে করেন এই রীতিগুলি এসেছে বিবর্তনের ডারউয়িনীয় নিয়মে। গান ছিল পরিবার বা গোষ্ঠীর ভিতরকার জিনিস, গোষ্ঠীগুলি ছিল বিচ্ছিন্ন, ফলে এক একটা গোষ্ঠীর সঙ্গীতচেতনা এক-এক পথে এগিয়েছে। এই অর্গানিক তত্ত্ব মানা যায় না। আজকের বিশিষ্ট গায়কীগুলি কোন পরিবার বা গোষ্ঠীর অবচেতন সুরবোধের ফসল নয়, কয়েকজন প্রতিভাশালী গায়কের পরীক্ষা-নিরীক্ষার ফল। এঁদের প্রায় সকলেই উনিশ শতকের দ্বিতীয়ার্ধে শিক্ষা শেষ করেছিলেন। প্রায় সকলেই একাধিক গোষ্ঠীভূক্ত ওস্তাদের কাছে শিখেছিলেন। এই বিচিত্র অভিজ্ঞতা তাঁদের পরীক্ষায় উদ্বুদ্ধ করেছে। পরীক্ষার শেষে প্রত্যেকেই নিজেদের গায়কী প্রচার করতে টেনে নিয়েছেন প্রতিভাশালী হিন্দু ছাত্রদের। এইভাবে গানের ইতিহাসে গায়নরীতির প্রবর্তক এই কয়েকজন ওস্তাদ সামাজিক বেড়া ভেঙ্গে দেওয়ার ব্যাপারেও বৈপ্লবিক ভূমিকা নিয়েছেন। এঁদের মধ্যে অগ্রগণ্য আল্লাদীয়া খাঁ, আব্দুল করীম খাঁ, কিছুটা ইমদাদ খাঁ। অর্থাৎ, গোষ্ঠীর দান তো নয়ই, গায়কী বা আধুনিক অর্থে ঘরানা গোষ্ঠী ভেঙে যাওয়ারই নিদর্শন। বা বলা যায় গান চর্চার উত্তরণ গোষ্ঠী থেকে ব্যক্তিতে।

কেন গায়কীর বিবর্তন ব্যক্তিনির্ভর এবং যুগপরিবর্তনের দান তা বোঝা কঠিন নয়। দুটো জিনিস পরীক্ষার জন্যে অত্যন্ত জরুরী। এক, সচেতন চেষ্টা ও বোধের সমন্বয়, যা সবসময়েই দুর্লভ। দুই, যথেষ্ট যোগাযোগ, যার ফলে বিভিন্ন ধারার মধ্যে আদানপ্রদান, তুলনা, ও সচেতন মিশ্রণ সম্ভব হয়ে ওঠে। এই যোগাযোগের সুযোগ উনিশ শতকের প্রথমার্ধেও কম ছিল। হয়তো সবথেকে বড়ো কথা, নতুন সৃষ্টির জন্যে দরকার বৃহত্তর শ্রোতাসমাজ যারা নিজেরা গোষ্ঠীর বাইরে, ঐতিহ্যের ধার ধারে না, ভালবেসে গান শোনে। এ রকম শ্রোতা তৈরি হয় যখন গান শুনতে হলে জমিদারের সভাসদ হওয়ার দরকার করে না, সামান্য পয়সা খরচ করেই গান শোনা যায়। সচেতন সৃষ্টিশীলতার এই পূর্বশর্তগুলি – বিদেশযাত্রা, বাণিজ্যকরণ, রেলগাড়ি, ইত্যাদি - উনিশ শতকের দ্বিতীয়ার্ধে তৈরি হয়।

Scanned with CamScanner

একাল : গোষ্ঠী থেকে ব্যক্তি

বিশ শতকের শেষ তিন-চার দশকে গানের জগৎ অনেক সম্পদ হারিয়েছে। জমিদারি আর দেশীয় রাজাদের অপসারণের সাথে পৃষ্ঠপোষকরা চলে গেছে। মুসলমান ওস্তাদদের অনেকে সময়ের সঙ্গে তাল মিলিয়ে চলতে পারেন নি। দেশবিভাগে অন্য শিল্পের তুলনায় গানের ক্ষতি হয়েছে কম, কারণ তার আগেই উত্তর ভারতের গান পুবে আর পশ্চিমে গিয়ে বাসা বেঁধেছে। তবে ক্ষতি হয়েছে পাঞ্জাবের ঘরানাগুলিতে, যাদের অনেকে পাকিস্তানে চলে যান, যেখানে রসিক সমাজ কখনো দানা বেঁধে উঠতে পারে নি। ক্ষতি হয়েছে ইতিহাসচেতনাতে। হিন্দুস্থানী গান যে ইন্ডো-ইসলামিক সংস্কৃতির দান ও পরিচায়ক, সেই সংস্কৃতি সম্বন্ধে আমাদের জ্ঞান বরাবরই ভাসাভাসা ছিল, হিন্দু নবজাগরণের ঠেলায় আরও দুর্বল হয়ে পড়েছে। স্বাধীনতার পরে বেশ কিছুকাল সরকারী পৃষ্ঠপোষকতা, বিশেষ করে বেতারের প্রচার, ওস্তাদী গানের বড়ো অবলম্বন হয়ে ছিল। টিভি-র যুগ শুরু হওয়ার পর থেকে সরকারী রেডিও নিঃশব্দে হাত গুটিয়ে চলেছে। অন্যদিকে অবশ্য সরকার হিন্দুস্থানী গানকে রাজনীতির প্রতীক হিসেবে ব্যবহার করতে সবসময়েই তৈরি। তাই এয়ার ইন্ডিয়ার অত্যন্ত নিকৃষ্ট পরিষেবার অপরিহার্য অঙ্গ শাস্ত্রীয় গান।

কিন্তু এই যুগের অনেককিছুই সম্ভাবনাময়। এই প্রবন্ধের 'মর‍্যাল' হল, বাজারীকরণের সাথে সাথে হিন্দুস্থানী সঙ্গীত গত দুশো বছরের ইতিহাসে যেমন ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছে, তেমনি সমৃদ্ধও হয়েছে। ক্ষতি আর উপকার দুয়েরই উৎস গান শোনা, শেখা, চিন্তা আর চর্চার উত্তরণ গোষ্ঠী থেকে ব্যক্তিতে। উনিশ শতকের শেষে বিশ শতকের গোড়ায় গানের জগতে এক জাতীয় নবজাগরণ ঘটেছিল। পুরোনো ধাঁচের গোষ্ঠী, যাতে প্রবেশাধিকার সবসময়েই সীমিত ছিল, তার সময় শেষ হয়ে আসে। দলছাড়াদের যুগ শুরু হতে গান শোনা, শেখা, আর গান নিয়ে লেখালেখি, প্রচুর বাড়ে। যুগান্তরের সময়ে সৃষ্টিশীলতা বেড়ে যাওয়ারও সম্ভাবনা থাকে। আজ সেই যুগান্তর প্রায় শেষ। এখন দলছাড়ারাই দলে ভারি, যাদের উপস্থিতি সবথেকে সরাসরি দেখা যায় সিডি-র দোকানে কি টিকিটের লাইনে।

মানুষ স্বভাবতই গোষ্ঠীবদ্ধ, হয়তো বর্তমান অবস্থাটাও একটা সন্ধিক্ষণ। দলছাড়া শ্রোতা আর গায়কেরা যখন সঙ্ঘবদ্ধ হবে, তখন গানের জগতে আবার

Scanned with CamScanner

বড়ো বদল আসবে। সেই বদলের কিছু পূর্বলক্ষণ দেখা যায় ওয়র্ল্ডওয়াইডওয়েবের অসংখ্য আলোচনাচক্রে। যান্ত্রিক প্রচারের এই অভাবনীয় বিপ্লবের সামনে দাঁড়িয়ে নিরাশ হওয়া কঠিন।

ইন্টারনেটে অনাবাসী গোয়ান মারাঠীদের আলোচনাচক্রে শুনতে পাবেন গোয়া রেডিওর একজন প্রতিভাবান শিল্পীর কথা। ভীমসেন-মল্লিকার্জুনের ঢেউয়ে ভেসে যাওয়া উত্তর কর্ণাটকের কোন অল্পখ্যাত স্কুলের অল্পখ্যাত গুরুর ছাত্র। জুনের এক বৃষ্টিভেজা সন্ধ্যায় এই 'অখ্যাত' গায়কের গান শুনতে যাই পুণার এক হলঘরে। গিয়ে দেখি হল ভেঙে শ্রোতার ভিড়। চেয়ার পাওয়া যায় না, সামনের সারি আয়োজকদের বন্ধুবান্ধবরা অনেক আগেই দখল করে ফেলেছে। সেখানে শহরের বেশ কিছু হোমরা-চোমরা উপস্থিত। পেছনে দাঁড়িয়ে বা বসে সরব কাচ্চাবাচ্চা নিয়ে একগাদা পরিবার। বোঝা গেল কাচ্চাবাচ্চারা গান শেখে। ইন্ডিপপ্ পরিবেশ। গান ভাল শোনা হল না, জনতার ঢেউ দেখে তাজ্জব হয়ে ফিরে এলাম। জাকির হুসেন হলে কথা ছিল।



গানের ছবি : গীতবিতানের ত্রিধারা[১]

সূত্রপাত

সুপ্রিয় ঠাকুর

ললিত কলা কেন্দ্র ও কলাভবন আয়োজিত যে অনুষ্ঠানে আমরা আজ সমবেত হয়েছি, সেই অনুষ্ঠানটি ভূয়সী প্রশংসার দাবী রাখে। গান থেকে ছবি – কি অসাধারণ চিন্তা। এই অনুষ্ঠানের জন্য লতিত কলা কেন্দ্র ও কলাভবনকে আমি আন্তরিক সাধুবাদ জানাচ্ছি।

বিশ্বভারতীতে চিন্তা ভাবনার সুযোগ ইদানিং বেশ সীমিত হয়ে গিয়েছে। সেই দুর্দিনে এই ধরণের প্রচেষ্টা দেখলে বিশেষ আনন্দ হয়।

আজ থেকে বেশ কদিন ধরে এই ক্যাম্পটি চলবে। সেখানে পূজা প্রেম প্রকৃতি - গীতবিতানের এই তিন পর্যায়ের উপর সুচিন্তিত আলোচনা শোনা যাবে। তারপর শ্রেষ্ঠ তিনজন গায়ক গায়িকার কণ্ঠে আমরা পূজা প্রেম প্রকৃতি পর্যায়ের গান শুনব। সর্বোপরি এই আলোচনা ও গানের সাহায্যে যে ছবি প্রকাশিত হবে তা রং তুলির সাহায্যে ধরে রাখার জন্য উপস্থিত হয়েছেন নামী শিল্পীবৃন্দ। চক্ষু কর্ণ ও মনের এই রকম তৃপ্তির খোরাক সহজে জোটেনা।

গান শুনি আমরা কানে, ছবি দেখি চোখে। আপাত দৃষ্টিতে একটি থেকে অন্যটিতে পৌঁছবার পথ অনুভূত হয় না। একটু গভীর ভাবে চিন্তা করলেই লক্ষ করা যায় যে সব অভিজ্ঞতার পিছনে যা কাজ করে তা তো মন। আর অভিজ্ঞতার নাম হল জীবন। সুতরাং ইন্দ্রিয়ের বেড়া পেরিয়ে যাওয়া ততটা কঠিন হওয়ার কথা নয়। তা ছাড়া ভারতবর্ষের ঐতিহ্যে তো এর নজিরের অভাব নেই। আমাদের দেশের

---

[১] রাষ্ট্রীয় ললিত কলা কেন্দ্র, কলকাতা ও চিত্রকলা বিভাগ, কলাভবন, শান্তিনিকেতন আয়োজিত চিত্রকর কর্মশালা "পূজা, প্রেম ও প্রকৃতি" [১৫-২১ ডিসেম্বর ২০০৪] উপলক্ষে ১৫ ও ১৬ ডিসেম্বর ২০০৪ কলাভবনে অনুষ্ঠিত সভায় পরিবেশিত বক্তব্যের পরিমার্জিত রূপ।

Scanned with CamScanner

শিল্পীরা রাগরাগিনীর ছবি অতীতে এঁকেছেন। আর রবীন্দ্রসঙ্গীতের সুরের সঙ্গে যুক্ত হয়েছে কথা। ফলে গান শোনার অভিজ্ঞতা তো অনেক মুর্ত।

ইন্দ্রিয়ের বেড়া ভাঙার কথা রবীন্দ্রনাথের কাছে আমরা অনেক শুনেছি - ফুলের গন্ধ বন্ধুর মত জড়িয়ে ধরে, শুনেছি - আলোর চরণধ্বনি, শুনেছি - গভীর আলোর রবে তিমির কম্পিত হয়। সুতরাং একটা ইন্দ্রিয়গ্রাহ্য আনন্দ থেকে অন্য ইন্দ্রিয়গ্রাহ্য আনন্দে গতায়াত কেন সম্ভব হবে না ? একটি অভিজ্ঞতার কথা উল্লেখ করার লোভ সামলাতে পারছি না। একটি সিনেমা দেখেছিলাম যার একটি দৃশ্য মনের মধ্যে গেঁথে গেছে। আজ সে সিনেমার নামও স্মরণ নেই। সেই দৃশ্যে একটি অল্প বয়সী মেয়ে ও এক অন্ধ ব্যক্তি একত্রে বিটোফেনের একটি সিম্‌ফনি শুনছে। মেয়েটি সুর শুনতে শুনতে উত্তেজিত হয়ে সেই অন্ধ ব্যক্তিকে বলতে শুরু করে যে সেই সুর তার কাছে কোন দৃশ্যগুলি বহন করে আনছিল। শরৎ অপরাহ্নের দৃশ্য। বনে বড় বড় গাছগুলির পাতা রং বদল করে লালচে হয়ে উঠেছে। একটি একটি করে পাতা খসে পড়ছে। বনের মধ্যে দিয়ে একটি ঝরণা কুলকুল শব্দে নুড়িগুলির উপর দিয়ে বয়ে চলে ইত্যাদি। অন্ধ ব্যক্তি যত সে বর্ণনা শোনে - সেও যেন এক নতুন জগতের সঙ্গে পরিচিত হয়। মেয়েটির কাছে সঙ্গীত দৃশ্য হয়ে ওঠে আর সেই অন্ধ - যার কাছে দৃশ্য জগৎ অপরিচিত - বর্ণনা শুনে সে কি পায় তা জানতে ইচ্ছা করে। কেন যে সিনেমার এই দৃশ্যটি আমার মনে দাগ কেটেছিল তা বলতে পারব না। এখানেও তো সুরের দৃশ্য বর্ণিত হয়েছে। অনেক গানে ছবি বেশ স্পষ্ট হয়েই ধরা পড়ে। কথা ও সুরের সমন্বয়ে রূপরেখা সহজেই ধরা দেয়। অন্যত্র গভীরে অন্বেষণের প্রয়োজন হয়। কোন ক্ষেত্রে বিমুর্ত ধারণার আশ্রয় প্রয়োজন। যাই হোক - এ ক্ষেত্রে সম্ভাবনার অন্ত নেই। সেই জন্যই এ অন্বেষণ বিশেষ চিত্তাকর্ষক হয়ে দাঁড়ায়।

যেমন গান থেকে ছবিতে যাওয়ার আয়োজন হয়েছে এই ক্যাম্পে তেমনই এর উল্টোটাও সম্ভব। অর্থাৎ ছবিরও তো সুর রয়েছে। রবীন্দ্রনাথের আঁকা একটি সন্ধ্যার দৃশ্য দেখলেই তো আমার পূরবী রাগিনীর কথা মনে পড়ে যায়। এই রকম আরও অনেক ছবির কথা উল্লেখ করা সম্ভব।

Scanned with CamScanner

শুধু যাওয়া-আসা

আলপনা রায়

জীবনের শেষপ্রান্তে 'গীতবিতান'কে নতুন ক'রে সাজাবার কথা ভেবেছিলেন রবীন্দ্রনাথ। তার কিছুকাল আগে, ১৩৩৮সালে (১৯৩১-৩২) তিন খণ্ডে প্রথম প্রকাশিত হয়েছে গ্রন্থানুক্রমে সংকলিত তাঁর গানের সংগ্রহ 'গীতবিতান'। সে-বিন্যাস তৃপ্ত করেনি রবীন্দ্রনাথকে। ভাবের অনুষঙ্গ রক্ষা ক'রে পুনর্বিন্যাসে মনোযোগী হয়েছিলেন তিনি। ১৩৪৫-৪৬ সালে (১৯৩৮-৩৯) তাঁর অভিপ্রায় অনুসারে "পূজা", "স্বদেশ" এবং "প্রেম", "প্রকৃতি", "বিচিত্র" ও "আনুষ্ঠানিক" নামে ছ-টি পর্যায়ে সাজিয়ে মুদ্রিত হয়েছিল 'গীতবিতান' দ্বিতীয় সংস্করণের দুটি খণ্ড। 'বিরল প্রচারিত' এই খণ্ডদুটি পুনঃপ্রকাশিত হলো রবীন্দ্র-প্রয়াণের ছ-মাস পরে, ১৩৪৮ মাঘ মাসে (১৯৪২)। তাঁর প্রথম গীতসংকলন 'রবিচ্ছায়া' (১৮৮৫) থেকে 'কাব্যগ্রন্থ' দশম খণ্ড (১৯১৬) পর্যন্ত "বিবিধ সংগীত", "জাতীয় সংগীত", "অনুষ্ঠান সংগীত", "ব্রহ্মসংগীত" কিংবা "ধর্মসংগীত" নামে পরিচিত ছিল গানের বিভাগগুলি। 'ধর্মসংগীত' একটি স্বতন্ত্র সংকলনখণ্ডের মর্যাদা পেয়েছিল 'গানে'র ১৯১৪ সালের সংস্করণে ; যদিও "বিবাহসংগীত" ছিল 'ধর্মসংগীতে'র অন্তর্ভুক্ত। গানের প্রসঙ্গভিত্তিক বিন্যাস প্রথম দেখা গেল নতুন লেখা ('আনুমানিক ১৩২১ পৌষ থেকে ১৩৩২ পৌষ') গানের সংকলনগ্রন্থ 'প্রবাহিণী'তে (১৩৩২। ১৯২৫) : "গীতগান", "প্রত্যাশা", "পূজা", "অবসান", "বিবিধ", "ঋতুচক্র", "উদ্বোধন" এই বিভাজনের সবটুকুই অবশ্য মিলিয়ে নেওয়া যাবে না 'গীতবিতানে'র পর্যায়ের সঙ্গে। 'প্রবাহিণী'তে "পূজা"র অন্তর্গত যেমন 'ওই সাগরের ঢেউয়ে ঢেউয়ে' ('গীতবিতান', "বিচিত্র"), তেমনি ঋতুচক্রের কোনো-কোনো গান ছড়িয়ে পড়েছে 'গীতবিতানে'র "পূজা", "প্রেম", "বিচিত্র" ও "আনুষ্ঠানিক" পর্যায়ে। তাহলেও, ব্রহ্মসংগীত বা ধর্মসংগীতের সীমা পেরিয়ে 'প্রবাহিণী'তেই ত্রিশটি গান প্রথম "পূজা"র গান হিসেবে চিহ্নিত হলো। পরে তাঁর সমগ্র গীতসংকলন 'গীতবিতানে' (দ্বিতীয় সংস্করণ। প্রকাশ ১৯৬৮) "পূজা"র গানের সংখ্যা হয় ৬১৭, আর ১৩৫৭ (১৯৫০) সালে কানাই

Scanned with CamScanner

সামন্ত পরিকল্পিত ও সম্পাদিত নতুন তৃতীয় খণ্ডের "পূজা ও প্রার্থনা"র গানগুলি ধরলে দাঁড়ায় ৭০০। 'ধর্ম' কথাটি রবীন্দ্র-ভাবনায় পেয়েছে ব্যাপ্ত তাৎপর্য, তবু "ব্রহ্মসংগীত" বা "ধর্মসংগীত" নামে যে সাম্প্রদায়িক ইঙ্গিত মনে হতে পারে, পূজা সেই বন্ধন থেকে মুক্তি দেয়, দেয় বিস্তার। নামের পরিবর্তনে গীতিগুচ্ছের তাৎপর্যও যায় বদ্‌লে। এখন এই গান দেশ-কাল-জাতি-ধর্ম-সম্প্রদায় নির্বিশেষে হয়ে উঠতে পারে যে-কোনো মানুষের গান। রবীন্দ্রনাথের পূজার গান শুধু উপাসনার নয়, নিভৃত উপলব্ধির গান – আত্মবোধের, আত্মজাগরণের, আত্মদীক্ষার গান। এই গানের দেবতা – 'নিভৃত প্রাণের দেবতা', এর ধর্ম 'মানুষের ধর্ম'। "পূজা"র গানগুলিকে কবি সাজিয়ে তুলেছিলেন একুশটি উপপর্যায়ে : গান ; বন্ধু ; প্রার্থনা ; বিরহ ; সাধনা ও সংকল্প ; দুঃখ ; আশ্বাস ; অন্তর্মুখে ; আত্মবোধন ; জাগরণ ; নিঃসংশয় ; সাধক ; উৎসব ; আনন্দ ; বিশ্ব ; বিবিধ ; সুন্দর ; বাউল ; পথ ; শেষ ; পরিণয়। পরম্পরার সম্ভাবনাময় এই সূক্ষ্ম বিভাগগুলি একটু যত্ন ক'রে লক্ষ করলে চারশোর কাছাকাছি প্রেমের গানের মাত্র দুটি ভাগ : প্রেম ও প্রেমবৈচিত্র্য, অতৃপ্তি জাগাতে পারে উৎসুক পাঠকের ; প্রায় তিনশো প্রকৃতির গানে ঋতুবিষয়ক ভাগগুলিকেও একটু সরলীকৃত মনে হ'তে পারে।

এই প্রসঙ্গে অবশ্য এ-কথাটিও মনে রাখা জরুরি যে রবীন্দ্রনাথের তখন পরিণত বার্ধক্য, ক্লান্ত শরীর ও মন ; তাই ভাবের অনুষঙ্গ রক্ষা ক'রে যে-ধরনে গানগুলিকে সাজাবার পরিকল্পনা ছিল, পারেননি তা। তাঁর ব্যবহৃত প্রথম সংস্করণ 'গীতবিতান' গ্রন্থটি অনুসরণ করলে মনে হয়, বিনয়, আনন্দ, নির্ভর, ধিক্কার, উচ্ছ্বাস, বেদনা, মাধুর্য, সাড়া, আশ্বাস, নিবেদন, স্তব, সন্ধান, প্রার্থনা, পূর্ণতা, ডাক, সংকল্প, উপলব্ধি, প্রতীক্ষা প্রভৃতি ভাবের অনুষঙ্গে সাজাবেন সমগ্র 'গীতবিতান'। কিন্তু ভগ্নস্বাস্থ্য ও সময়াভাবের কারণে শেষ পর্যন্ত শুধু "পূজা" পর্যায়টিকেই সাজিয়ে নিয়েছিলেন ভাবের ইঙ্গিতবাহী উপবিভাগে। অন্যান্য গান সীমাবদ্ধ রইল বিষয়-আশ্রিত পর্যায়ে।

গানগুলির এই অতিনির্দিষ্ট পর্যায়বিভাগে অনেক ক্ষেত্রেই অস্বস্তি হয় রবীন্দ্রমগ্ন পাঠকেরও। বোধ হয়, "পূজা"-"প্রেম"-"প্রকৃতি"র কোনো-কোনো গান যেন অনায়াসেই ঠাঁই বদল করতে পারে পরস্পরের মধ্যে। "প্রকৃতি"র গান হিশেবে চিহ্নিত 'মেঘের

Scanned with CamScanner

পরে মেঘ জমেছে, আঁধার করে আসে / আমায় কেন বসিয়ে রাখ একা দ্বারের পাশে' কিংবা 'আজি ঝড়ের রাতে তোমার অভিসার / পরাণসখা বন্ধু হে আমার'। প্রকৃতির পটভূমিতে বর্ষার অনুষঙ্গে, ব্যাকুল হৃদয়ের প্রতীক্ষার ছবি প্রধান হয়ে উঠেছে দুটি গানে, অনুভব শুধু ভিন্ন। প্রথম গানে 'তোমারই আশ্বাসে' ব'সে-থাকা, 'তুমি যদি না দেখা দাও', তাহ'লে বৃথা হবে এই 'বাদলবেলা'। দেখা পাওয়ার নিশ্চয়তা বেশি অন্য গানটিতে : 'পরানসখা বন্ধু হে আমার', তোমার 'অভিসার' আমার দিকে। ঝড়ের রাতে সুদূর নদীর পার আর গহন বনের ধার দিয়ে, গভীর অন্ধকার পেরিয়ে তুমি আসছ। এদের কি বলা যাবে "প্রকৃতি"রই গান ? "প্রেমে"র গান নয় কেন ? এই দুটি গানে তো রূপ পেয়েছে কোনো প্রেমিক বা প্রেমিকার প্রতীক্ষাই। যে-কারণে "প্রকৃতি" পর্যায়ে নয়, "প্রেমে"র গান হয়ে উঠেছে 'আজি গোধূলিলগনে এই বাদলগগনে / তার চরণধ্বনি আমি হৃদয়ে গণি / সে আসিবে আমার মন বলে', ঠিক সেইজন্যই ঐ-গানদুটিরও "প্রেমে"র গান হ'তে বাধা হয় না ; আর যদি মনে থাকে, এই গানদুটি 'গীতাঞ্জলি'র গান, তাহ'লে হয়তো এদের "পূজা"র গান ভাবতেও পছন্দ করবেন কেউ-কেউ। বিশেষত 'আজি ঝড়ের রাতে তোমার অভিসার' হয়তো পৌঁছতে চাইবে সেখানে, যেখানে শুনতে পাব ঝড়ের রাতের অবসানে 'সকালবেলায় চেয়ে দেখি / দাঁড়িয়ে আছ তুমি এ কী / ঘরভরা মোর শূন্যতারই বুকের পরে'। মনস্ক পাঠকমাত্রেরই মনে পড়বে এই "পূজা"র গানটিও এক ঝড়ের রাতের গান : 'যে রাতে মোর দুয়ারগুলি ভাঙল ঝড়ে / জানি নাই তো তুমি এলে আমার ঘরে'।

এইভাবেই প্রকৃতির গান 'মধ্যদিনের বিজন বাতায়নে' বা 'আজি তোমায় আবার চাই শুনাবারে' কিংবা 'ঝরাপাতা গো, আমি তোমারি দলে' হয়ে উঠতে পারে "প্রেমে"র গান। আবার, 'আকাশে আজ কোন্ চরণের আসা-যাওয়া', 'ছুটির বাঁশি বাজল যে ওই নীল গগনে' বা 'দিয়ে গেনু বসন্তের এই গানখানি' "প্রেম" থেকে সরিয়ে আনা যেতে পারে "প্রকৃতি" পর্যায়ে ; যেমন 'ওগো কাঙাল, আমারে কাঙাল করেছ', 'আমার পরাণ লয়ে কী খেলা', 'আহা তোমার সঙ্গে প্রাণের খেলা', 'আমার সকল নিয়ে বসে আছি', 'আমি তোমার প্রেমে হব সবার কলঙ্কভাগী' প্রভৃতি "প্রেমে"র গানগুলিকে মনে হয় "পূজা"স্পর্শী।

Scanned with CamScanner

"পূজা" "প্রেম" আর প্রকৃতির মধ্যে কোনো আড়াল ভেবে নেওয়া প্রায় অসম্ভব রবীন্দ্রনাথের গানে, অল্প কয়েকটি গান ছাড়া। অনুভবের বেদনা আর প্রকাশের ব্যাকুলতায় অবিরাম আনাগোনা চলে এই তিনটি পর্যায়ে। এক ছবি থেকে, কখনো হয়তো ছবি ভেঙে, গ'ড়ে ওঠে আরেক ছবি। আবার কখনো বেণীবন্ধের মতো মিলে যায় গানের ত্রিধারা, সৃজিত হয় বহুমাত্রিক ছবি।

॥ ২ ॥

"ছবি জিনিসটা হচ্ছে অবনীর, গান জিনিসটা গগনের। অসীম যেখানে সীমার মধ্যে সেখানে ছবি ; অসীম যেখানে সীমাহীনতায় সেখানে গান। রূপরাজ্যের কলা ছবি, অপরূপ রাজ্যের কলা গান" কিংবা "চিত্র ভাবকে আকার দেয় এবং সংগীত ভাবকে গতি দান করে। চিত্র দেহ এবং সংগীত প্রাণ . . ." ধরনের উক্তির মধ্যে বিভিন্ন সময়ে ছবি ও গানের পরিপূরক সম্বন্ধের কথা স্মরণ করিয়ে দিয়েছেন রবীন্দ্রনাথ। 'বাক্যের সৃষ্টি'র ওপর যখন তাঁর 'সংশয় জ'ন্মে গেছে', সেই শেষজীবনে এই দুই কলাই হয়েছে তাঁর আশ্রয়। কিন্তু তার বহু আগে, রঙ-তুলির সঙ্গে যখন কোনো নিবিড় সম্বন্ধ হয়নি তাঁর, তখনো তাঁর গান ভ'রে উঠেছে চিত্রময়তায়। আবহমান সাহিত্যে কথার ভাষায় চলেছে ছবি আঁকা ; রবীন্দ্রনাথ গানে সেই চিত্রজগৎকে বিস্তার দিয়েছেন কথায়-সুরে, বর্ণনা আর বর্ণিলতায়।

কখনো একটি সম্পূর্ণ গানই হয়ে উঠেছে যেন এক নিটোল ছবি : 'একলা বসে হেরো তোমার ছবি এঁকেছি আজ বসন্তী রঙ দিয়া' (প্রেম ৬৯)। প্রসঙ্গত, এই গানের উৎস-কবিতাটির নামও "ছবি"। বসন্ত-মধ্যাহ্নে এক নারীকে কেন্দ্রে রেখে আঁকা হয়ে উঠেছে এই ছবি। তাকে ঘিরে রয়েছে প্রকৃতির বাসন্তিক পরিমণ্ডল। আবার কখনো টুকরো-টুকরো ছবি ছড়িয়ে আছে তাঁর গানে, এমন উদাহরণ অবিরল। 'আজ ভ্রমর ভোলে মধু খেতে – / উড়ে বেড়ায় আলোয় মেতে, / আজ কিসের তরে নদীর চরে চখা-চখীর মেলা' (প্রকৃতি ১৪৩) বা 'শালের বনে থেকে থেকে / ঝড় দোলা দেয় হেঁকে হেঁকে, / জল ছুটে যায় এঁকেবেঁকে মাঠের 'পরে' নিসর্গের দুটি দৃশ্য। দ্বিতীয়টিতে বহিঃপ্রকৃতি থেকে ছবি স'রে আসে অন্তরে, বর্ষার ঘনঘটার সঙ্গে মিলে যায় 'অন্তরে আজ কী কলরোল, / দ্বারে দ্বারে ভাঙল

Scanned with CamScanner

আগল – / হৃদয়-মাঝে জাগল পাগল আজি ভাদরে' (প্রকৃতি ৩৪)। পারম্পর্যে গাঁথা হয়ে যায় বহির্জগৎ ও অন্তর-প্রকৃতির ছবিদুটি। "প্রকৃতি"র গানে যেমন দৃষ্টিগ্রাহ্য বর্ণনার প্রাধান্য, তুলনায় "প্রেম", কিংবা আরও বেশি "পূজা"র গানে প্রধান হয়ে ওঠে অন্তর্লোকের ছবি।

রবীন্দ্র-গানে প্রায় সব ছবিই সজীব, সচল। ছবিগুলি তাই নিশ্চল স্থির দৃশ্যমাত্র হয়ে থাকে না ; মুহূর্তকে ছুঁয়ে থেকেও পায় ক্ষণসীমাকে পেরিয়ে যাওয়ার গতি। জানালার কাছে করতলে মাথা রেখে ব'সে থাকে যে-মেয়েটি, তার কোলে ফুল প'ড়ে আছে কিন্তু সে 'ভুলে গেছে মালা গাঁথা'। এ পর্যন্ত আমরা পাই এক স্থিরচিত্র। কিন্তু এখানেই বর্ণনা থেমে থাকে না, কবি আঁকেন, তার 'চোখের উপরে মেঘ ভেসে যায়, / উড়ে উড়ে যায় পাখি – সারাদিন ধ'রে বকুলের ফুল / ঝ'রে পড়ে থাকে থাকে' (নাট্যগীতি ২৭)। পটে আঁকা ছবিটি পায় এক চলার মাত্রা।

গানের ছবিগুলি কখনো হয়ে উঠেছে সপ্রাণ চিত্রকল্প যেন। প্রকৃতি থেকে দেওয়া যায় এমন অজস্র দৃষ্টান্ত : 'বাদল বাউল বাজায় রে একতারা', 'শ্রাবণসন্ন্যাসী রচিল রাগিণী', 'বৃষ্টি আসে মুক্তকেশে আঁচলখানি দোলে', 'আলোছায়ার আঁচলখানি লুটিয়ে পড়ে বনে বনে', 'দুলিয়ে জটা ঘনঘটা পাগল হাওয়ার গান সে গায়', 'ওই গগনের দীপগুলিরে হেমন্তিকা করল গোপন আঁচল ঘিরে', 'হিমের ঘন ঘোমটাখানি ধূমল রঙে আঁকা' ইত্যাদি। "পূজা"র গানে আছে চিত্রকল্পের এক অসামান্য প্রতিমা: 'নীরব নিশি তব চরণ নিছায়ে / আঁধার কেশভার দিয়েছে বিছায়ে' (পূজা ১৩)। স্তব্ধ অন্ধকার রাত্রি, নিবিড় কেশভার-বিছানো প্রণত এক নারী যেন। গভীর অন্ধকারের রঙ থেকেই কি উঠে আসে এই ছবি ? তৈরি হয়ে যায় না কি নিশি আর 'কেশ'-এর বর্ণসাম্য থেকে গ'ড়ে-ওঠা এক ভাবসেতু ? যেমন, ঘনবর্ষায় মাঠে-মাঠে সবুজ ঘাসের বিস্তার কবির অনুভবে ব'য়ে আনে সবুজ মেঘের ছবি (প্রকৃতি ৬৪) কিংবা "প্রেমে"র গানে দেখি 'নীল আকাশের সুরটি নিয়ে বাজাক আমার বিজন মনে, / ধূসর পথের উদাস বরণ মেলুক আমার বাতায়নে' (প্রেম ৭১)। শুধু নীল আর ধূসর রঙের বিপ্রতীপতায়ই নয়, 'সুর' আর 'বরণ' মিশে গিয়ে অনুভবকে পুর্ণতা দেয় এক চিত্রগীতিময়তায়। এমনই আরেক ছবি : 'নাগকেশরের ঝরা কেশর ধূলার সাথে মিতা / গোধূলি সে রক্ত আলোয় জ্বালে আপন চিতা' (প্রেম ১৭৩)।

Scanned with CamScanner

নীল সবুজ পীত সোনালি ধূসর সাদা কালো, এমন বহু বিচিত্র রঙের কল্পনা ছড়িয়ে আছে তাঁর গানে। সুনীল সাগরের শ্যামল কিনারে 'তুলনাহীনা'কে যেমন তিনি পেয়েছিলেন সুরে-সুরে : 'ইমনে কেদারায় বেহাগে বাহারে' (প্রেম ৩৮), তেমনি এক 'অন্তরতর' সত্তার আভাস জড়িয়ে থাকে বিশ্বনিখিলের রঙে-রঙে : 'সোনালি রূপালি সবুজে সুনীলে' (পূজা ২৫)। এইসব পরিচিত রঙের সঙ্গে পাই আমাদের অচেনা 'বসন্তী' রঙ। এ কি বসন্তের রঙ, পীত না বাসন্তী ? 'একলা ব'সে হেরো তোমার ছবি' যে বসন্তী রঙে আঁকা হয়, সে কোনো বিশেষ রঙ নয় ; মৌমাছির গুঞ্জন, প্রজাপতিদলের নানা রঙের মেলা, গোলোকচাঁপা আর রঙ্গনের বর্ণসমারোহ, আকাশের স্বর্ণাঞ্জলি - সব মিলিয়ে বসন্তের এক মিশ্র অনুভবের রঙ হয়ে ওঠে 'বসন্তী' — কোনো একটিমাত্র রঙের গোত্রে তাকে চিনে নেওয়া যায় না আর।

আবার, বসন্তের ঝরাপাতা যখন বসন্তী রঙে তার শেষ হোলি খেলে তখন হঠাৎ মনে হ'তে পারে এ বুঝি বসন্ত-সমাপনের বিবর্ণ-হলুদ রঙ। কিন্তু তার পরেই শুনি : 'তোমারি মতো আমারো উত্তরী / আগুন রঙে দিয়ো রঙিন করি' (প্রকৃতি ২৮৩)। বোঝা যায়, এ-রঙ লাল। বসন্তের আবীরের অনুষঙ্গে বসন্তী তখন 'অস্তরবির ' আভায় রঙিন। যে লাল রঙ তাঁর দৃষ্টি এড়িয়ে যায় ব'লে ধারণা অনেকের, সেই অরুণরক্তিম আর আগুনের রঙ ফিরে-ফিরে এসেছে তাঁর গানে, বিশেষত শেষ বয়সের গানে এবং ছবিতে। গান আর ছবির মধ্যে এমনি ক'রে কি এক সংযোগও তৈরি হয়ে যায় না তাঁর সৃষ্টিতে ?

দৃষ্টিগোচর রঙের মতো গানের কোনো-কোনো ছবি কবির চেতনার রঙে প্রগাঢ় হয়ে ওঠে : প্রাণের রঙ, আলোর রঙ, বিবাহের রঙ, ব্যথার রঙ, স্পর্শের রঙ, সুরের রঙ। আকাশের নীলে যেমন সুরের রঙ দেখেন তিনি, তেমনি তাঁর অনুভবে 'সুরের ধারা' হয়ে ওঠে 'সোনার বরণ' (পূজা ৩০)। বিবাহের রঙ বা আলোর রঙও তাঁর কাছে লাল কিংবা সোনালি : কিন্তু 'রোদের সোনা' পায় পাকা ফসলের রঙের ছোঁয়া (প্রকৃতি ১৭৯) আর সায়ংসন্ধ্যার অস্তসূর্যের রক্তিমাভায় ছেয়ে যায় বিবাহের রঙ (পূজা ১৪১)। স্পর্শের রঙ (পূজা ৫১৬) যেমন তাঁর কাছে লাল, তেমনি রক্তিম বর্ণচ্ছটায় তিনি দেখেন ব্যথার রঙ (বিচিত্র ৮৩)।

Scanned with CamScanner

'গীতবিতান'কে নতুন ক'রে সাজিয়ে তোলার সময়ে রবীন্দ্রনাথের বিশ্বাস ছিল শুধু গান হিশেবে নয়, কবিতার মতো পাঠযোগ্যও হয়ে উঠবে এই সংকলন। সত্যিই কি গানের ছবি ধরা পড়ে, বা পড়তে পারে, সুর-নিরপেক্ষভাবে ? 'পুবে বাতাস এল হঠাৎ ধেয়ে / ধানের ক্ষেতে খেলিয়ে গেল ঢেউ' (বিচিত্র ৭৫) আর 'চাঁদের মতো অলখটানে জোয়ারে ঢেউ তোলাব' (প্রেম ৯০) : এই দুই ঢেউয়ের স্বতন্ত্র স্পন্দন সুর ছাড়া কি সত্য হয়ে উঠতে পারে ? কিংবা 'আমের মঞ্জরী'র (প্রকৃতি ১৯২) গন্ধে মিশে 'গানে'র 'গুন্‌গুন্‌' 'গুঞ্জরণ' আর দখিন বাতাসের 'শন্‌শন্‌' সঞ্চরণও কি শোনা যায় সুরহীনভাবে ?

রবীন্দ্রনাথের গানে সুরও হয়ে ওঠে রূপকল্প : সুরের ধারা, সুরের ফুল, সুরের মালা, সুরের আগুন, সুরের হোমানল, সুরের অর্ঘ্য, সুরের ব্যথা, সুরের রঙ, এমন-কি সুরের সাহস। কত বিচিত্র অনুভবে আর অনুষঙ্গে সুর পেয়ে যায় রূপের বা ভাবের ইঙ্গিতময় অবয়ব। রাগরাগিণী অনেক সময়েই তাঁর কাছে হয়ে ওঠে প্রকৃতির বিমূর্ত ছবি : ভৈরোঁ যেন ভোরবেলার আকাশেরই প্রথম জাগরণ ; পরজ যেন অবসন্ন রাত্রিশেষের নিদ্রাবিহ্বলতা ; কানাড়া যেন ঘনান্ধকারে অভিসারিকা নিশীথিনীর পথবিস্মৃতি ; ভৈরবী যেন সঙ্গবিহীন অসীমের চিরবিরহবেদনা ; মূলতান যেন রৌদ্রতপ্ত দিনান্তের ক্লান্তিনিশ্বাস ; পূরবী যেন বিধবা সন্ধ্যার অশ্রুমোচন। কোনো শিল্পরসিক হয়তো উৎসাহী হতে পারেন রাগমালা চিত্রকলার সঙ্গে এই বর্ণনার সাযুজ্য-সন্ধানে। কিন্তু এমন নয় যে একটি রাগরূপ একই ভাবছবি নিয়ে উপস্থিত হয়েছে রবীন্দ্রগানে। ভৈরবী যেমন তাঁর রচনায় বিরহবেদনার রূপ পায়, তেমনি আনন্দোচ্ছ্বাসেরও প্রকাশ হয়ে ওঠে। শাস্ত্রনির্দিষ্ট চিত্রকলায় রাগের আলম্বন বা উদ্দীপন উল্লঙ্ঘনে যে অনীহা বা দ্বিধা ছিল শিল্পীদের, গানে সেই নিষেধনির্দেশ অতিক্রম ক'রে গিয়েছিলেন রবীন্দ্রনাথ, বিপ্লবের কোনো উচ্চকিত রোল না-তুলেই। এখানেই হয়তো রাগমালা চিত্রকলার সঙ্গে আলাদা হয়ে যায় তাঁর ভাবনার পথ।

কিন্তু ছবিতে তাকে পাওয়া যায় কীভাবে ? গানের ছবিকে রঙে-রেখায় কি ধরা যায় ? ধরা যায় না, এমনই মনে করেন অনেকে। কিন্তু ছবি আর গান অথবা গান আর ছবির দেওয়া-নেওয়া কি অনিবার্যতই হয়ে উঠতে চায় দুই সর্বসম সৃষ্টি ?

Scanned with CamScanner

কোনো প্রতিসাম্য রচনার স্পর্ধা থেকে নয়, একটির আবেশও তো মথিত ক'রে জাগিয়ে দিতে পারে অন্যের আবেগ ; একের নিঃশব্দ তর্জনীতে প্রাণিত হ'তে পারে ভিন্ন সৃষ্টির উদ্বেলতা। গানের ছবি চিত্রশিল্পীর তুলিতে হয়ে উঠতে পারে এক নতুন সৃষ্টি। শুধু গানের ছবি থেকেই-বা কেন, যে-কোনো গান থেকেই সৃষ্টি হ'তে পারে ছবি, যেমন ছবি থেকে গান* বা কোনো-এক শিল্প থেকে অন্য শিল্প। কোনো একটি না-ও হয়ে উঠতে পারে অন্যটির প্রতিরূপ, হয়তো কখনোই হয়ে উঠবে না সর্বসম। তা প্রত্যাশিত নয়, সম্ভবও নয় হয়তো। হয়তো বাইরে থেকে চেনাও যাবে না পারস্পরিক কোনো সম্পর্ক। এক শিল্প থেকে অন্য শিল্পে অবিরাম যাওয়া-আসায় তাই থাকে সম্পর্কসূত্রের নানা কৌণিকতা, নানা স্তর : কোথাও প্লাবনের উচ্ছ্বাস, কোথাও নিরুত্তাপ অবলোকন, কোথাও ইশারাময় উদ্ভাস, কোথাও প্রতিন্যাসের আয়োজন, কোথাও-বা চেতনার অনুরণন। শিল্প থেকে শিল্পে – এই মুহূর্তে আমাদের আলোচনায় গান থেকে ছবিতে – 'অনুবাদ' তাই শুধু দুই শিল্পের প্রকাশ-আয়তনের তর্জমার প্রসঙ্গ নয়। তার থেকে অনেক গভীর ও ব্যাপ্ত তার পরিসর : এক স্বপ্নোত্থিতার জাগরণের রূপকথা যেন, যার ভেতরে আছে অনুভবের চেতনার সম্বিতের উতরোল বিস্তার, নিজের শিল্পক্ষেত্রে প্রকাশের গুহামুখ খুঁজে পেলেই তার মুক্তির চরিতার্থতা।

গান কীভাবে রাঙিয়ে দিতে পারে ছবিকে, জ্বালিয়ে দিতে পারে তার কল্পনার শিখা, এই কর্মশালায় তারই উজ্জ্বল উদ্ধারের অপেক্ষা করব আমরা।

---

* রবীন্দ্রনাথেরই 'নিভৃত প্রাণের দেবতা' ও 'তুমি যে সুরের আগুন' গানদুটির উৎস নন্দলাল বসু ও অসিতকুমার হালদারের দুই ছবি।

রবীন্দ্রনাথের গানে পূজা ও অনুবাদের খেলা

রমিত রায়

পূজার কথা বলতে গিয়ে কেবলই অনুবাদের কথাই উঠে আসছে - যাকে পূজা করি, সেই দেবতার কথা কিভাবে বলি ? 'কী গাব আমি, কী শুনাব, আজি আনন্দধামে . . . কেমনে বর্ণিব তোমরা রচনা, কেমনে রটিব তোমার করুণা . . .' যে দেবতাকে অনুভব করেছি বা যে প্রকৃতিকে দেখেছি, তাকে ছন্দে বা গানে কি করে রূপান্তরিত করব ? আবার এক ধরনের text থেকে আরেক ধরনের text এ কি ভাবে সেই সব ভাবনা রূপান্তরিত করব ? 'কী গাব আমি' গানে কিন্তু একটা সংশয় দেখা যায় - সেখানে যেন বলা হচ্ছে যে গান লেখাটা যেন অর্থহীন - কেননা প্রকৃতিই যেন সেই দেবতার কথা তার সব phenomena র মাধ্যমে বলে দিয়েছে : 'তব নাম লয়ে চন্দ্র তারা অসীম শূন্যে ধাইছে - রবি হতে গ্রহে ঝরিছে প্রেম, গ্রহ হতে গ্রহে চাইছে। অসীম আকাশ নীলশতদল তোমার কিরণে সদা ঢলঢল, তোমার অমৃতসাগর-মাঝারে ভাসিছে অবিরামে।'

তবে একটা জিনিস স্পষ্ট – প্রেম, প্রকৃতি, পূজার গানগুলির মধ্যে একটা গভীর যোগসূত্র আছে - এমনকি, একেক সময়ে কোন গানটা ঠিক প্রেমের বা প্রকৃতির বা পূজার, তা বলা কঠিন হয়ে ওঠে। এই ব্যাপারটা একদিকে অনুবাদের অন্য একটা সমস্যা হিসেবে দেখা যায় - প্রেম পূজা প্রকৃতি কি একই ? একের কথা বলতে গিয়ে আরেকের কথা উঠে এলে মুস্কিল নয় কি ? নাকি এই একাকার ভাবটাই প্রকৃত অর্থে প্রেম পূজা প্রকৃতির নিভৃত সত্য ? আর সেই সত্যটাই গানে কবিতায় ছবিতে নৃত্যে নাটকে রূপান্তর বা অনুবাদ করাই শিল্পের প্রকৃত কর্তব্য নয় কি ?

যে যোগসূত্রের কথা বলছি তা কী ?

— বিশ্বের সঙ্গে যোগ, বিশ্বদেবতার সংগে যোগ, ব্যক্তিবিশেষের সংগে প্রেমের যোগ, এরা সকলেই যেন চিরদিনের চেনা

— অথচ এদের থেকে বিচ্ছেদ হয়েছে বা হওয়ার সংশয় আছে, অথচ এদের প্রতি টান অক্ষুন্ন

— এই বিচ্ছেদের ভয়ের সঙ্গে মিলে গেছে পুনর্মিলনের আশা

Scanned with CamScanner

এই ভাবগুলি প্রেম পূজা প্রকৃতির গানে সব সময়ই দেখা যায়।

রবীন্দ্রনাথ নিজে তাঁর পূজা পর্যায়ের গানের আরও নিখুঁত ২১টি ভাগ করেছিলেন। কেবল এই সংখ্যাটাই ভাবিয়ে তোলে - পূজার এত রকম রূপ তিনি দেখেছিলেন আর গানে দেখাতে চেয়েছিলেন ? আবার, এই ২১টি উপপর্যায় বা অনুপর্যায়, এমনকি অণুপর্যায়ের শীর্ষকগুলিও চিন্তায় ফেলে, কিন্তু এদের একটা মজা আছে, আর এদের শৃঙ্খলারও একটা মজা আছে। প্রথমেই 'গান' - গানই পূজার এক রূপ। তারপর 'বন্ধু', 'প্রার্থনা', 'বিরহ'! 'সাধন ও সংকল্প'-র পরে 'দুঃখ', দুঃখের পর 'আশ্বাস'। এরপর 'অন্তর্মুখে', 'আত্মবোধ', 'জাগরণ', ফলে 'নিঃসংশয়' 'সাধক', যে 'উৎসবে' 'আনন্দে' বিভোর, 'বিশ্ব' ও বিশ্বের 'বিবিধ' কে, 'সুন্দর' কে উপভোগ করতে ডরায় না, এমনকি 'বাউল' হয়ে 'পথে' নামতে দ্বিধা নেই, যে পথের 'শেষ' আছে কিনা না জেনেও সেই শেষের খোঁজে সে বেরিয়েছে। কিন্তু এই 'শেষ' শেষ নয় - শেষ আছে 'পরিণয়ে', মিলনে ? কাদের মিলনে ? পূজার এত রকম মানে, পূজার রূপ এত কিছুতে 'অনুবাদ' হয়ে যাচ্ছে ? আর একেক রূপ একে অপরের মধ্যে 'অনূদিত' হচ্ছে ?

অনুবাদের আক্ষরিক অর্থ 'দেখানো' - Auslegung, Deutung - যা অগোচরে, তা খুলে দেখানো। যে অর্থ নজরের বাইরে, তাকে সহজ সুলভ করে তোলা - অচেনা ভাষার গোপনীয়তা থেকে চেনা ভাষার আধারে পরিবেশন করা। এই অর্থে, যে কোনও ধার্মিক কথা অনুবাদের চরম রূপ - যে অর্থ সব চেয়ে গোপন - দেবতা - তাকে মনুষ্যবোধের সামনে বোধগম্য করে তোলা। গোপন অর্থকে যেমন এক দুর্গম স্থান থেকে সহজসুলভ জায়গায় নিয়ে আসা অনুবাদ, তেমনই এই কাজে মধ্যস্থতা করাও অনুবাদকের একান্ত লক্ষ্য। দেবতার পুরোহিতরাই তাই বিশ্বের প্রথম অনুবাদক, প্রথম শিল্পী। তারা প্রাকৃতিক phenomena গুলিকেই দেবতার বিভিন্ন রূপ হিসেবে বুঝেছিলেন। এবং তাঁদের প্রথম অনুবাদের প্রয়াস ছিল এই প্রাকৃতিক শক্তিগুলিকে নকল করা - মুখোশ পরে, তাদের অঙ্গভঙ্গি নকল করে, তাদের সুর লয় ছন্দ নকল করে। এর থেকেই যেমন দেবতার রূপের ধার্মিক আন্দাজ করেছিল মানুষে, তেমনই এই সবের থেকেই চিত্রকলা, ভাস্কর্য, নৃত্য, সংগীত, বাদ্য ইত্যাদির আবির্ভাব হয়। Mimesis ই ধর্মের ও শিল্পকলার প্রথম রূপ, এই মিমেসিসই প্রথম অনুবাদের প্রয়াস। মিমেসিস ও অনুবাদের মূলে আছে আরও একটি কথা - inspiration বা enthusiasm। আক্ষরিক অর্থে 'দেবতার

Scanned with CamScanner

সত্ত্বাকে মনুষ্য চেতনায় প্রবেশ করতে দেওয়া' - সাদা কথায়, দেবতা যখন পুরোহিতকে ভর করে, সেই অবস্থাই হল inspiration বা enthusiasm। শিল্পকলার সৃষ্টিতে ও অনুবাদেও এই ঘটনাটা লক্ষ্য করা যায়। যার কথা শিল্পের মাধ্যমে বলতে চাই, তার নিভৃত সত্ত্বাকে সেই শিল্পের আধারে প্রবেশ করতে দিতে হবে, তবেই সেই কাজ হয়ে উঠবে সজীব। শুধু কৌশলের বা technique এর সাধনে শিল্প হয় না, এ কথা সকলেই মানেন। Technique তৈরি হয়েছিল এই intuitive inspiration কে objective রূপ দেওয়ার জন্য। সে হয়ে উঠল ritual। নতুন করে কি ভাবে প্রথাগত ritual এর বাইরে দেবতাকে অনুভব করা যায়, প্রকৃতিকে পাওয়া যায়, ভালবাসা যায়, তাই খোঁজে শিল্প, তাই খুঁজেছিলেন রবীন্দ্রনাথ তাঁর গানে। তিনি বুঝেছিলেন যে জোর করে এই সবকে ধরা যায় না, তাদের প্রতীক্ষায় থাকতে হয়, তাদের আগমনের জন্য মনের যত জটিলতা, আমির যত অহংকার ত্যাগ করতে হয়। কিন্তু তাদের পাওয়া যে তাতেও নিশ্চিত, তা তো নয় - তারা কখন যে এসে ঘুরে যাবে, তা বলা যায় না - সেই যে ক্ষ্যাপা পরশ পাথর খুঁজতে গিয়ে পাবে না ভেবে কখন আসল পাথরটা হাতে নিয়েও না দেখে ফেলে দিয়েছিল, বা 'যে রাতে মোর দুয়ারগুলি ভাঙলো ঝড়ে, জানি নাই কো তুমি এলে আমার ঘরে', অথবা 'আমি তারেই খুঁজে বেড়াই যে রয় আমার মনে . . . তারি বাণী হঠাৎ . . . আন্‌মনা কোন্‌ তানের মাঝে আমার গানের সুরে . . . সে মোর চিরদিনের', 'আমার হিয়ার মাঝে লুকিয়ে ছিলে, দেখতে আমি পাইনি . . . বাহির পানে চোখ মেলেছি, হৃদয়-পানে চাইনি . . . তুমি ছিলে আমার কাছে, তোমার কাছে যাইনি', 'দাঁড়িয়ে আছো তুমি আমার গানের ও পারে – আমার সুরগুলি পায় চরণ, আমি পাইনে তোমারে . . . তোমার সাথে গানের খেলা দূরের খেলা যে, . . . কবে নিয়ে আমার বাঁশি বাজাবে গো আপনি আসি'।

রবীন্দ্রনাথ তাঁর গানে এই ধরণের inspiration এর প্রতীক্ষার কথা বলেছিলেন। আবার তিনি ১৯১২ সালের 'অন্তর-বাহির' প্রবন্ধে প্রকৃতি বা দেবতা-অনুভূতির আক্ষরিক নকল করার বিরুদ্ধে সচেতন করেছেন। বলেছেন যে মনের ভিতরের সঙ্গে বাইরের জগতের একটা যোগ আছে, কিন্তু 'সে যোগ অনুরূপতার যোগ নহে, . . . সে যোগ সম্পূর্ণ বৈসাদৃশ্যের যোগ . . . মিল যে কোনখানে ধরিবার জো নাই। তাহা অনির্বচনীয় মিল, তাহা প্রত্যক্ষ প্রমাণযোগ্য মিল নহে।' আমাদের আত্মচেতনা বা "আমি" বলিতে যাহাকে বুঝি তাহা বাহিরের দিকে কত শব্দ গন্ধ স্পর্শ, কত

Scanned with CamScanner

মুহূর্তের চিন্তা ও অনুভূতি, . . . তাহা বাহিরের রূপের প্রতিরূপ মাত্র নহে, বরঞ্চ বাহিরের বৈপরীত্যের দ্বারাই সে ব্যক্ত হইতেছে। বিশ্বের অন্তরতর এই অপরূপকে প্রকাশ করিবার জন্যই শিল্পীদের গুণীদের এত ব্যাকুলতা। — এই পৃথিবীর অন্তরতর অপরূপতাই আমাদের চিত্তের সামগ্রী।' অথচ এই 'অন্তরতর অপরূপতা' শুধু জলের ঢেউ এর, বজ্রের গর্জনের নকল করলে ধরা দেয় না। এই নকলের বাড়াবাড়ি হলে ব্যাপারটা হাস্যকর হয়ে ওঠে। বরং, 'অন্তরতর সংগীতটিকে গুণীরা অন্তঃকরণ দিয়া শুনিয়াছেন — বিশ্বেশ্বরের খাস মহলের গোপন নহবতখানায় যে কালে কালে ঋতুতে ঋতুতে নব নব রাগিনী বাজিতেছে, আমাদের গুণীদের অন্তঃকর্ণে তাহা প্রবেশ করিয়াছে।' তাই 'সকাল বেলাকার কোনো বহিরঙ্গের সঙ্গে এই সংগীতকে মিলাইবার চেষ্টা করিতে গেলে সে চেষ্টা ব্যর্থ হইবে।' সেই অর্থে রবীন্দ্রনাথের মনে হয়েছিল যে য়ুরোপীয় সংগীত 'হৃদয়াবেগের উত্থানপতনকে সুরের ও কণ্ঠস্বরের ঝোঁক দিয়া খুব করিয়া প্রত্যক্ষ করিয়া দিবার চেষ্টা। . . . কিন্তু গান তো স্বভাবের নকল নহে . . . হৃদয়াবেগের নকল করিতে গেলে সংগীতের সেই গভীরতাকে বাধা দেওয়া হয়।' রবীন্দ্রনাথের মতে, 'বস্তুত, যেখানে অশ্রুর ভিতরকার অশ্রুটি ঝরিয়া পড়ে না এবং হাস্যের ভিতরকার হাস্যটি ধ্বনিয়া উঠে না, সেইখানে সংগীতের প্রভাব। সেইখানে মানুষের হাসিকান্নার ভিতর দিয়া এমন একটা অসীমের মধ্যে চেতনা পরিব্যাপ্ত হয়, যেখানে আমাদের সুখদুঃখের সুরে সমস্ত গাছপালা নদীনির্ঝরের বাণী ব্যক্ত হইয়া উঠে এবং আমাদের হৃদয়ের তরঙ্গকে বিশ্বহৃদয়সমুদ্রেরই লীলা বলিয়া বুঝিতে পারি।'

দেখ্‌তে গেলে এই হিসেবে, গানের সুর ও গানের কথার মধ্যে একটা অদ্ভুত যোগ আছে। একদিকে কথার সঙ্গে সুর মেলা চাই। কিন্তু এই যোগ কি কেবল নকলের যোগ - যেমন 'চাঁদের মতো অলখ টানে জোয়ারে ঢেউ-উ-উ-উ তোলাব'? এই আপাত বাইরের নকলের পিছনে আরও গভীরে কি একটা যোগ আছে ? সেটা কি কথা-সুরের বিশেষ সমন্বয়ে ধরা পড়ে ? কি ভাবে ধরা পড়ে ? আসলে কথা যেমন অর্থের আকস্মিক প্রতিনিধি, তেমনই সুরও অর্থের আকস্মিক প্রতীক, এবং কথা ও সুরের যোগও আকস্মিক, চাপিয়ে দেওয়া, arbitrary। কিন্তু আশ্চর্যের কথা এই যে গানে কথা-সুরের এই মিলন মনে হয় যেন চিরকালের সত্য, necessary, and not arbitrary। গানের এই আধারে এবার কথা ও সুর সমানে একে অপরে অনুবাদ হতে থাকে। এই আশ্চর্য যোগকে সজীব করে তোলে

Scanned with CamScanner

গায়ক-গায়িকার গান, তাদের গানের interpretation। আমরা কোনও গানের স্বরলিপি যখন প্রথম দেখি, তখন সবই কেমন arbitrary মনে হয়। কিন্তু স্বরলিপির ছাঁদ পেরিয়ে গানের গভীর রূপ দেখতে পেলে সে গানের spirit যেন অবিচ্ছেদ্য হয়ে আমাদের গলায় প্রবেশ করে। কথা ও সুরের এই অদ্ভুত সম্পর্কের কোনও বাঁধাধরা ব্যাকরণ বা শব্দকোষ নেই। প্রতিটি গানের নিজস্ব ব্যাকরণ ও শব্দকোষ আছে - প্রতিটি গানে কথা ও সুরের মৌলিক একটা সম্পর্ক আছে। সেখানে রাগ-রাগিনীর বিশুদ্ধতা রক্ষা হল কি না, সে বিষয়ে হয়তো আর কোনও প্রশ্ন থাকে না। প্রশ্ন ওঠে, অমুক গানে অমুক কথা অমুক সুরে কী বলতে চাইছে ? এবং সেই কথাটা কি ভাবে গেয়ে দেখানো যেতে পারে ? এইভাবেই, রবীন্দ্রনাথ গান লিখতে গিয়ে প্রায়ই রাগ-রাগিনীর খুবই creative আর subjective প্রয়োগ করেছেন, আর সে কথা নির্দ্বিধায় স্বীকারও করেছেন।

রাগ-রাগিনীকে নিজের মতো ব্যবহার করতে তিনি নিতান্তই aesthetic কারণে বাধ্য হয়েছিলেন, কেননা তিনি যে যে ধরণের গান রচনা করছিলেন, সে গান গতানুগতিক রাগ-সুরের মাধ্যমে প্রকাশ করতে তিনি আড়ষ্ট বোধ করছিলেন। একদিকে যেমন রাগ-রাগিনীর প্রথাগত রূপ তাঁর কাছে শিকলবদ্ধ, ফলে arbitrary মনে হয়েছিল, অন্যদিকে তেমনই তিনিও নিজের subjective interpretation এ দেখা রাগরূপ arbitrarily তাঁর গানের কথার সঙ্গে মিলিয়েছিলেন। এই নতুনত্বের ঝুঁকি নিয়েছিলেন, যে নতুন কথা পুরনো ভাষায় পুরনো সুরে বলা যায় না, তাকে বলার জন্যে। হল কি হল না, তা যাচাই করার ক্ষমতা একমাত্র aesthetic বোধের পক্ষেই বলা সম্ভব। এই বোধ যে কেবল বহুদিনের সাধনায় পাওয়া যায়, তা বলাই বাহুল্য। অবশ্য, aesthetics এর কিছু objective ও formal মাত্রা বা মানদণ্ড আছে, সেগুলিও জানা চাই, কিন্তু এ সবের উপরেও একটা aesthetic আছে যার কোনও মাপকাঠি নেই - সে কেবল অনুভব করা যায়। এই ভিতরের aesthetic-ই রবীন্দ্রনাথের গানের লক্ষ্য। রবীন্দ্রনাথের পূজা যে দেবতাকে উপলক্ষ করে, সে এই সুন্দরের দেবতা। বহু গানে সেই দেবতার সৃষ্টির aesthetic এর প্রতি গানের 'আমি' তার বিস্ময় প্রকাশ করেছে। এই aesthetic দেবতার কথা আরও অনেকে বলেছেন - যেমন জার্মান দার্শনিক Friedrich Nietzsche। তিনি বলেছেন যে 'শিল্পই মানুষের আসল অলৌকিক

Scanned with CamScanner

ধর্ম (metaphysische Taetigkeit)।'[১] বলেছেন যে 'বিশ্বের অস্তিত্ব একমাত্র aesthetic phenomenon হিসেবে justify করা যায় . . . দেবতা কেবলমাত্র এক নিঃশয় (unbedenklich) এবং নীতিহীন (unmoral) দেবতা . . .তিনি সৃষ্টিতে, ধ্বংসে, ভালোয় মন্দে আপন আনন্দ ও আত্মগৌরব অনুভব করেন, তিনি বিশ্বব্রহ্মাণ্ডের সৃষ্টি করতে করতে নিজেকে পূর্ণতা ও প্রাচুর্যের প্রয়োজনীয়তা থেকে, নিজের মধ্যে ঠেকিয়ে রাখা বৈপরীত্যের বেদনা থেকে নিজেকে মুক্তি দিয়েছেন। বিশ্বই দেবতার প্রাপ্ত মুক্তি - বিশ্বই সেই দেবতার চির পরিবর্তনীয়, চির নূতন দৃষ্টি (Vision) . . . যিনি সবার চেয়ে বেশি বেদনা ও বৈপরীত্য সয়েছেন . . . যিনি একমাত্র appearance এর মাধ্যমেই মুক্তি পান।' এমন একটি চিন্তাধারা Nietzsche প্রকাশ করেছেন, যা 'অস্তিত্বের moral interpretation ও গুরুত্বের বিরুদ্ধে . . . ভাল-মন্দ বিচারের পরপারের pressimism . . .'

Nietzsche moral ব্যাপারটাকেই ইন্দ্রিয়গ্রাহ্য জগতে টেনে এনে তাকে 'ভ্রান্তি', apperance, ভ্রম, পাগলামি, ব্যাখ্যা, সংস্কার বা সংশোধন (Zurechtmachung), শিল্প হিসেবে দেখেছেন। তাঁর চোখে যে ধর্ম - যেমন বিশেষ করে খৃষ্টধর্মের মতো ধর্ম - শিল্পের বিরুদ্ধে, সেই ধর্ম জীবনবিমুখ - কেননা, Nietzsche-র মতে 'সমস্ত জীবনই ইন্দ্রিয়গ্রাহ্য বাস্তব, শিল্প, ভ্রম (Taeuscheung), দৃষ্টি (Optik), Perspective ও ভ্রমের অপরিহার্যতার উপর নির্ভরশীল।'

এই aesthetic দেবতা যে নিজেকে মুক্তি দিতে ইন্দ্রিয়গ্রাহ্য জগতে নিজেকে প্রকাশ করে, translate করে - তবে তো এই প্রকৃতিই সেই অপরূপের রূপ, সেই ভাল-মন্দ বিচারের পরপারের ছোঁওয়াই তো প্রেমের রূপ, যে প্রেম ব্যক্তিবিশেষকে সেই বিশ্বের দেবতা ও প্রকৃতির সঙ্গে মিলিত করে। এদেরই কথা কি রবীন্দ্রনাথের গানে নানা রূপে translated হয়েছে ? মোট কথা, আমরা রবীন্দ্রনাথের গান ছবিতে যন্ত্রসংগীতে film এ অনুবাদ করতে গেলে এই নানা স্তরের অনুবাদগুলি দেখতে পাব - আর সেই অনুবাদগুলিকে অনুবাদ করাই হয়তো হয়ে উঠবে বিভিন্ন medium এর মধ্যে আদানপ্রদানের একটি অন্যতম উপাদান।

---

[১] Friedrich Nietzsche, Die Geburt der Tragoedie, 1971
Nietzshe-র সমস্ত উক্তি এই বই থেকে নেওয়া।

Scanned with CamScanner

প্রেম আর গান আর ছবি

পুলক দত্ত

২০০২ সালের পঞ্চম Kochi International Triennial Exhibition of Prints-এ জাপানি শিল্পী কাজ্রিরো সাতোর একটি রঙিন wood engraving প্রদর্শিত ও পুরস্কৃত হয়। ছবিটির নাম From collected Poems of Tagore "God grows weary of great kingdom, but never of little flowers."। সৃজনশীল সমস্ত মাধ্যমই একে অপরকে স্পর্শ করতে পারে নিশ্চয়ই। একই অনুভব প্রকাশিত হতে পারে বিভিন্ন ভাষায়, দেশে, কালে। রবীন্দ্রনাথের কবিতার চিত্রায়ন তাই সম্ভব হল একবিংশ শতাব্দীর জাপানি শিল্পীর wood engraving-এ।

সঙ্গীতে বাস্তবের প্রতিরূপায়নের অবকাশ অন্যান্য যে কোন শিল্পমাধ্যমের তুলনায় সবথেকে কম। প্রকৃতিতে যে আওয়াজ আমরা কানে শুনি তার অনুকরণে সঙ্গীত সৃষ্টি অসম্ভব। প্রকৃতির সঙ্গে তার কোনো প্রত্যক্ষ যোগ সম্ভব নয়। শিশুদের কোলাহল, দাঙ্গার আওয়াজ, মেঘের ডাক, জলস্রোতের আওয়াজ, নিশ্বাসের আওয়াজ, নিশ্বাস না নিতে পারার গোঙানি – এই ধরনের শ্রবনের কোনো অভিজ্ঞতারই সাঙ্গীতিক উপস্থাপনা সম্ভব নয় গলায় বা যন্ত্রে এর অনুকরণের মাধ্যমে। যে কোনো অভিজ্ঞতার সাঙ্গীতিক প্রকাশ ঘটে গতি, লয় আর বিভিন্ন স্বরসমষ্টির নির্দিষ্ট নক্সায়। ‘পুবে বাতাস এল হঠাৎ ধেয়ে, ধানের ক্ষেতে খেলিয়ে গেল ঢেউ’। গতি আর লয় প্রকাশ করল দৃশ্যগত এক অভিজ্ঞতা - পুবের বাতাসের আনা ধানের ক্ষেতের ঢেউ। আবার যে ঢেউ চোখে দেখা যায় না সেও প্রকাশিত হল সেই লয় আর গতির ভাষায়। ‘আমি তোমায় যখন খুঁজে ফিরি ভয়ে কাঁপে মন, প্রেমে আমার ঢেউ লাগে তখন’। গরু চরিয়ে শেষ বিকেলে তাদের বাড়ি ফিরিয়ে নিয়ে যাবার সময়ে গাইবার যে প্রাচীন নরওয়েজিয়ান লোকগান আমরা শুনি সেখানে আছে শুধু আওয়াজ, তার কোনো অর্থ নেই, অর্থাৎ আছে শুধু গতি আর ছন্দ - গরুর ডাকের আওয়াজ আর বাড়ি ফেরার সুর তৈরি করেছে সেই লোকগান। আজকের যুগে কম্পিউটার অথবা মোবাইল ফোন খোলা-বন্ধ করার সুরেও সেই একই কৌশল লক্ষ্য করি আমরা।

Scanned with CamScanner

জেগে ওঠা আর ফিরে আসার অভিজ্ঞতা সুরের নক্সায় প্রকাশিত, যেমন দেখি জৌনপুরি আর শুদ্ধ কল্যাণের সাঙ্গীতিক কাঠামোয়।

রবীন্দ্রনাথের গানের দৃশ্যায়নের পরিচিত ক্ষেত্র অভিনয় আর নাচ। পুরোনো শান্তিনিকেতনের মানুষদের কাছে একটি বিখ্যাত নাচের কথা শুনেছি - 'আজি দখিন-দুয়ার খোলা' - দুহাত দিয়ে তালা খুলে দরজা খোলা, 'এসো হে, এসো হে, এসো হে'- তিনদিকে তিনবার হাতে ডাকার ভঙ্গী, 'আমার বসন্ত এসো' - এক হাত দিয়ে মুখে বসন্ত রোগের চিহ্নের ইশারা। এই একই গানের আরো অনেক রকমের নাচের সঙ্গে আমরা পরিচিত। প্রত্যেক ক্ষেত্রে একই গানকে নাচের রূপকাররা বুঝে নিয়েছেন বিভিন্ন স্তরে, বিভিন্ন গভীরতায়-আদরে-অবহেলায়। আর এই ভিন্নতাই রূপ দিয়েছে বিভিন্ন নাচের। রবীন্দ্রনাথের গানের ব্যবহারেও বিভ্রাট যে একেবারে ঘটে না, এমন নয়। শুনেছি কোনো এক মফস্বল শহরে চকচকে একটি কারাগার তৈরি হয়েছিল - মোজাইকের মেঝে, সিলিং ফ্যান ইত্যাদি। সেই কারাগারের উদ্বোধন হয়েছিল 'সবারে কবি আহ্বান' গান গেয়ে। কাঞ্জিরো সাতো ওই নির্দিষ্ট ছবিটি প্রসঙ্গে বলছেন, "Tagore, a great Indian poet, sensed the huge life stream of the universe and kept creating poetry on coexistence of God, nature and man. Hoping to come closer to his mind, I engraved his poem on the woodblock." শিল্পী কবিতার একটি নির্দিষ্ট লাইনকে বুঝে নিলেন একটি বিশ্ববোধ হিসেবে আর সেই বোধই প্রকাশিত হল ছবিটিতে। একটি কবিতার লাইনের দৃশ্যগত বিবরণের সংকীর্ণতা মুক্তি পেল বিশ্বের এক সামগ্রিকতা বোধে।

সঙ্গীত শুনতে শুনতে ছবি দেখতে পাবার অভিজ্ঞতা অল্পবিস্তর আমাদের সকলেরই আছে। সঙ্গীতের নির্ভর যেমন গতি, লয় আর বিশেষভাবে সাজানো স্বরসমষ্টি, ছবির নির্মাণেরও নির্ভর তেমনি আকার, কাঠামো, রঙ, ছবিতে কাজ করা আর না কাজ করা অংশের মধ্যে বিশেষ সম্পর্ক। ভাব, বক্তব্য অনুযায়ী এই নক্সার পরিবর্তন হয়। একটি মূর্ত হয় কালে, অন্যটি স্পেস-এ। এই দিক দিয়ে দেখলে দুটি মাধ্যমের গভীর স্তরের উপাদান আর কৌশল একই -গতি আর ছন্দ। তাই কেবলমাত্র গতি আর ছন্দকে নির্ভর করেই হতে পারে সঙ্গীতের চিত্রায়ন। শিল্পের

Scanned with CamScanner

জগতে এমন পরীক্ষা-নিরীক্ষার কথা আমরা জানি। এমনকি কবিতাও কখনো কখনো যেতে চেয়েছে গানের কাছাকাছি।

রবীন্দ্রসঙ্গীতকে কেমন করে শুনি আমরা ? কেউ শুনি কবিতা হিসেবে, কেউ কেবলমাত্র সুর হিসেবে আবার কেউ বা তার গতি আর ছন্দের দোলায় জাগিয়ে তুলি নিজেদের। অন্যদিকে, 'হিমের রাতের ওই গগনের দীপগুলিরে হেমন্তিকা' বয়ে নিয়ে আসে তীব্র ছাতিম ফুলের গন্ধ আর পুজোর ছুটির পর বন্ধুদের সঙ্গে আবার দেখা হবার অনুষঙ্গ। শান্তিনিকেতনের মানুষদের কাছে এই অভিজ্ঞতা সত্যি হলেও যাঁরা রবীন্দ্রসঙ্গীত শোনেন রেডিও, টেলিভিশন আর বন্ধ air conditioned ঘরে, তাঁদের কাছে এর কোনো মূল্য না থাকাই স্বাভাবিক। এঁদের প্রত্যেকের চিত্রায়নেই রবীন্দ্রসঙ্গীত পাবে ভিন্ন ভিন্ন রূপ।

রবীন্দ্রনাথের গানে যুক্ত হয়েছে কথা, কখনো সেই কথা তৈরি করে কোনো ছবি, কখনো কোনো গভীর অনুভব।

"বোলো অশ্রুজড়িত কণ্ঠে, বোলো কম্পিত স্মিত হাসে -
বোলো মধুরবেদনবিধুর হৃদয়ে শরমনমিত নয়নে
তোমার গোপন কথাটি"।

এই রকম নরম একটা ছবিই নির্ধারিত করেছে এই গানের বিশেষ সাঙ্গীতিক রূপটিকে।

"শিশিরসিক্ত বায়ে বিজড়িত আলোছায়ে
বিরহ-মিলনে-গাঁথা নব প্রণয় দোলায় দোলো
এবার অবগুণ্ঠন খোলো"।

এ ক্ষেত্রে সুরই নিয়ে এসেছে আমাদের শরীরে-হৃদয়ে নব প্রণয়দোলার দুলুনি।

কথা যখন সঙ্গীতে প্রকাশিত হয় তখন তার কাঠামোর মধ্যে ভাব অনুযায়ী ঘটে যায় এক বিরাট বিপ্লব। "নিবিড় ঘন আঁধারে জ্বলিছে ধ্রুবতারা", গানে এসে হয়ে

Scanned with CamScanner

যায় 'নিবিড় ঘন আঁ - ধারে জ্বলিছে ধ্রুবতা - রা-' অথবা "জাগে নাথ জোছনারাতে" হয় 'জা -। - গে - । না - - থ। জো - - । ছ না - - । - রা - । - - তে - । - - -।' এই 'জা' থেকে 'গে'-তে পৌঁছনোর মধ্যবর্তী কাল হয়ে ওঠে গভীরভাবে অর্থবহ। আর এই গান বাঁধা আছে তেওড়া, রূপক বা দীপচণ্ডীতে নয়, ধামারে - যে তালের ভাষায় বিশ্রামের এই যাদু আছে। 'ক ধি ট ধি ট ধা - । গ দি ন দি ন তা - ।' এই ধরনের বিশ্রামের প্রয়োগ অহরহ ঘটে চলেছে চিত্রকলার জগতে। এই বিশেষ উপাদানটির সচেতন প্রয়োগও গানের চিত্রায়নে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা নিতে পারে। অন্যদিকে রবীন্দ্রনাথ যেমন কথা বলেছেন সুরে তেমনি সেই একই কথা বলা সম্ভব ছবিতে। হরফের বিশেষ রূপ আর তাকে সাজানোর বিশেষ কৌশল নিয়ন্ত্রিত করতে পারে আমাদের সেই গানকে পড়ে নেবার অথবা দেখে নেবার প্রক্রিয়াকে। যেমন দেখি বিনোদবিহারী অথবা ঋতেন মজুমদারের কাজে।

রবীন্দ্রনাথের গান অংশগ্রহণ করার গান - মিলিত হবার গান - কথোপকথনের গান - সত্যের মুখোমুখি হবার গান। যে কোনো মিলিত হবার সম্মিলিত গানের - সে গান একাই গাই কি সকলে মিলে গাই - ঐতিহ্যের ধর্মই হল যে সে সমাজে-আকাশে-বাতাসে বিরাজ করতে পারে। 'আমাকে শোনো', 'আমাকে শোনো' বলে প্রেক্ষাগৃহের এক কোণে গিয়ে চেঁচায় না। গান উন্মোচিত হয় স্পেস্-এ - হয়ে ওঠে, সেই অর্থে, ছবি। ঠিক তেমনই সম্মিলিত হবার ছবিরও ধর্ম সেই একই - সমাজে-আকাশে-বাতাসে বিরাজ করতে পারার ক্ষমতা। যাদুঘরের বা গ্যালারির আলোকিত এক কোণে বসে অথবা কোনো পাবলিক বাড়ির গায়ে উৎকট রং লাগিয়ে 'আমায় দেখো' 'আমায় দেখো' বলে চেঁচায় না। ছবি উন্মোচিত হতে থাকে কাল-এ – হয়ে ওঠে, সেই অর্থে, সঙ্গীত। প্রেমই এই ধরনের শিল্প আর সঙ্গীতচর্চার প্রধান নির্ভর।

আমার কাছে রবীন্দ্রনাথের সব গানই তাই একটি স্তরে প্রেমের গান। রবীন্দ্রনাথের জগৎ মানুষ কেন্দ্রিক, কল্যাণ কেন্দ্রিক। রবীন্দ্রনাথের জগৎ তাই প্রেমের জগৎ।

Scanned with CamScanner

মুখ ঘুরিয়ে গোড়ায়

সৌমিক নন্দী মজুমদার

এক শিল্পী এবং এক শিল্পবেত্তার মধ্যে কথোপকথন। শিল্পীর সদ্য আঁকা একটি ছবি খুঁটিয়ে বোঝার চেষ্টা করছেন শিল্পবেত্তা। ছবির একেকটা অংশের দিকে, একেকটা আকারের দিকে নির্দেশ করে শিল্পবেত্তা জিজ্ঞেস করে চলেছেন –'এটা কী ? বাড়ি ?' শিল্পীর উত্তর – 'হ্যাঁ'।

শিল্পবেত্তা – 'আর . . . . এটা ?'
শিল্পী – 'এটা গাছ।'
– 'এটা ?'
– 'রাস্তা। আর রাস্তায় কাদা'
– 'এগুলো ?'
– 'পাহাড়ে বরফ হয়েছে।'
– 'আর এই নীল রঙটা ?'
– 'নদী।'
– 'আর, ওইটা, গোলাপীটা ?'
– 'ওটা গোলাপী !'
– 'গোলাপী ?'
– 'হ্যাঁ।'
– 'কিন্তু . . . গোলাপী কী ?'
– 'শুধুই গোলাপী, আর কিছু না, বলেই মুখ ঘুরিয়ে নিল শিল্পী'।

ওপরের এই সংলাপ থেকে হয়তো আঁচ করা যাচ্ছে যে শিল্পীটি খুবই খুদে এক চিত্রকর এবং শিল্পবেত্তা ঠিক খুদে না হলেও অল্পবয়সী, অনভিজ্ঞ এক কলেজ ছাত্র। উৎসাহের চপলতায় শিল্পবেত্তাটি ভেবেছিল যে একের পর এক প্রশ্ন করে শিল্পীর কাছ থেকে জেনে নেবে ছবিটায় কী কী আঁকা আছে ; অন্তত কী আঁকতে চেয়েছিল। নিশ্চিত হয়ে নেবে প্রতিটি আকার ও রঙের অর্থ সম্পর্কে। 'অপটু' হাতে

Scanned with CamScanner

আঁকা এই ধরণের ছবিতে প্রায়শই যে বোঝা যায় না কী এঁকেছে শিল্পী ! এই দুর্বোধ্যতা কাটাতেই, গোটা ছবিটা 'বুঝে' নেবার আগ্রহেই, একের পর এক প্রশ্ন - এটা কী, ওটা কী ? এই অত্যন্ত স্বাভাবিক কৌতূহলের পেছনে আছে এক নিঃশব্দ শর্ত – হয়তো শিল্পবেত্তার অজান্তেই। শিল্পবেত্তা এক বহু চর্চিত অভ্যাসবশত গোড়াতেই ধরে নিয়েছে যে ছবির প্রতিটি আকারই বুঝি কোনো না কোনো বস্তুকে উপস্থাপন করে, কোনো না কোনো আকৃতিগত পরিচয় আছে তার। এই পরম অভ্যেসটা ধাক্কা খেল উদ্ধৃত সংলাপের শেষে এসে যেখানে গোলাপী রঙের আকারটা কেবল গোলাপী রঙ হয়েই রইল – কোনো বিশেষ বস্তুকে আর চিহ্নিত করল না ! হঠাৎ করে ওই গোলাপী আকারটা যে অন্য কোনো বস্তুরূপের ধারক নয়, সে যে কেবলই একটা রঙ – এটা শিল্পবেত্তার কাছে প্রত্যাশিত ছিল না। বিশেষ করে, বাদবাকী আর সমস্ত আকারের যখন নির্দিষ্ট পরিচয় আছে ওই ছবিটাতে স্পষ্ট করেই।

একটা প্রত্যাশা যেমন ভাঙল, একটা বোধেরও উদয় ঘটল। ছবিতে রঙ-রেখা যে কখনো কখনো স্বয়ংসম্পূর্ণ হতে পারে, অন্য কোনো বস্তুর পরিচায়ক হবার তোয়াক্কা না করেই – এই বোধ। এই বোধোদয়টা ঘটল একটা খুদে শিল্পীর আঁকা ছবি থেকে, সেই শিল্পীর একটা প্রত্যয়ী উত্তর থেকে – 'এটা শুধুই গোলাপী, আর কিছু না।'

"ছোটোবেলায় আমি রাফায়েলের মতন ড্রয়িং করতে পারতাম আর বড় হয়ে কেবল চেষ্টা করেছি ছোটোদের মতন আঁকতে।" এ কথাটা শুনে মনে হয় পিকাসো যত না ছোটোদের ছবির তথাকথিত 'সারল্য'কে ঈঙ্গিত করছেন তার চেয়েও বেশী প্রলুব্ধ হয়েছেন ছোটোদের ছবিতে রঙ-রেখার আকারের স্বাধীনচেতনা উপস্থিতির প্রতি। পিকাসো তাঁর প্রখর দৃষ্টিতে বুঝেছিলেন যে ছবিতে মৌলিক উপাদানের স্বাধীন উপস্থিতি, যা সবসময় বস্তুপরিচয় মুখাপেক্ষী নয়, যা অহরহ দেখা দেয় ছোটোদের ছবিতে, আসলে ছবির ভাষা নিয়ে, ছবির ব্যাকরণ নিয়েই এক পরীক্ষা-নিরীক্ষা ; অভ্যাসের জড়তায় বদ্ধ এক নিয়মকে চ্যালেঞ্জ করা। এটা বুঝিয়ে দেওয়া যে রঙ, রেখা, আকার ইত্যাদি মৌলিক উপাদানের এমন কোনো বাধ্যবাধকতা

Scanned with CamScanner

নেই যে সে কেবলই অন্য কোনো বস্তুর পরিচয় বাহক, সে অবশ্যই করতে পারে স্বাধীন বিচরণ, অজস্র চিহ্নিতকরণের ভীড়ে হঠাৎ একটা উপাদান নিরপেক্ষ অস্তিত্ব পেতে পারে নিজস্ব চীৎকারে। এই মুক্তিযুদ্ধটা – যেটা এতো অনায়াসে ঘটে ছোটদের ছবিতে – আধুনিক পাশ্চাত্য শিল্পীদের করতে হয়েছিল কয়েক দশক ধরে। কেবলই উপস্থাপনা বা representation-এর দায় থেকে একটু একটু করে সরে এসে, তারা মুক্ত করেছিলেন ছবির ভাষাকে। গগাঁ ও সেজানের ছবিতে ধরা পড়েছিল এই প্রবণতা। গগাঁর রঙে এসেছিল প্রতীকী ব্যঞ্জনা, সেজান রঙের প্রলেপ ভেঙে ভেঙে নির্মাণ করার চেষ্টা করছিলেন বস্তুর কাঠামোগত ভারসাম্য, পাহাড়ের মতোই অবিচল এক চেতনা। মাতিস, পিকাসো, ব্রাক ও অন্যান্যরা প্রায় একটা প্রকল্পের মতো গ্রহণ করেছিলেন এই প্রবণতাকে। ঠিক সরাসরি বিমূর্ত শিল্প না নির্মাণ করলেও, বিমূর্তিকরণ ঘটছিল এদের ছবিতে। অন্তত গুটিয়ে বা লুকিয়ে রাখা হচ্ছিল বস্তুপরিচয়ের প্রত্যক্ষ চিহ্নগুলোকে, Charles Harrison যাকে বলছেন 'suppression of certain easily recognizable characteristics of the original subject'.[১] বরঞ্চ মালেভিচ্‌, কান্‌দিন্‌স্কী, আর্প, মন্‌দ্রিয়ান, রোদচেঙ্কো, ড্যোস্‌বুর্গ – এদের হাতে পড়ে, ফরাসী বলয়ের বাইরে, জর্মানী, অস্ট্রিয়া, হল্যান্ড ও রাশিয়ায় বিমূর্ত শিল্পের আন্দোলন পৌঁছল এক চরম বিন্দুতে। কেবল বির্মূত রূপই নয়, ছবির নামকরণেও এলো সেই অভিঘাত। মালেভিচের 'ব্ল্যাক স্কোয়ার', কান্‌দিন্‌স্কী'র 'পেইনটিং উইথ রেড স্পট', মনদ্রিয়ানের 'কম্পোজিশন', রোদচেঙ্কোর 'আনটাইটলড়' – এই নামকরণগুলোর মধ্যেই ঘটে গেল মূর্ত শিল্পের সঙ্গে চূড়ান্ত বিচ্ছেদ ; 'easily recognizable characteristics'কে 'suppress' করা নয় আর, কোনো রকম পরিচিতি লক্ষণকেই বরাবরের মতো পরিত্যাগ করা হল এবার। কোনো বিষয়ভিত্তিক উপস্থাপনা ব্যতিরেকে, ছবির ব্যাকরণের কয়েকটা মৌলিক উপাদানই (যেমন রঙ, আকার-বিন্যাস, রচনা ছন্দ) হয়ে উঠল ছবির বিষয় ও লক্ষ্য। যা ছিল চিহ্নিতকরণের বাহন, তারা নিজেরাই হয়ে উঠল একেকটা চিহ্ন, একেকটা বার্তা।

---

[১] Charles Harrison, 'Abstraction', *Primitivism, Cubism, Abstraction : The Early Twentieth Century*, Yale University Press, 1990.

Scanned with CamScanner

যেন, একদিকে মূর্ত শিল্প – পরিচিতি লক্ষণে ঠাসা, যার প্রতিটি বিন্দু ধারণ করে উপস্থাপনা-গুণ, অন্যদিকে বিমূর্ত শিল্প – ছবির ব্যাকরণ ও উপাদানেই দায়বদ্ধ, কোনো উপস্থাপনায় নয়। তৈরি হল এক দ্বান্দ্বিক সম্পর্ক। হয় এটা, নয় ওটা। অথচ এরকম কোনো আরোপিত দ্বন্দ্বের অবকাশ নেই ওই খুদে শিল্পীর আঁকা ছবিটাতে। রূপস্থাপনের সঙ্গে সঙ্গেই যে ছবির উপাদান নিতে পারে বিমূর্ত হবার দায়িত্ব, স্বয়ংসম্পূর্ণ হবার স্পর্ধা — এরকম একটা সমান্তরাল খেলা চলতে থাকে ওই ছবিটাতে। স্বতস্ফূর্ততার সংজ্ঞাও হয়তো খুঁজে পাওয়া যাবে এইখানে। কোনো পরিকল্পিত আয়োজনে নয়, বরং স্বাভাবিক, সাবলীল ইচ্ছায়। মৌলিক উপাদানের প্রতি আকর্ষণে, রঙ রেখার প্রতি অমোঘ টানে। এই অহৈতুকী, নিঃস্বার্থ টান কি আমাদের মজ্জাগত ? একে অপরকে চিনিয়ে দেওয়া, বহন করা, মূর্ত করার কাজে সদা ব্যস্ত আমাদের জীবনযাপনের ভাষা। তারই মাঝে মৌলিক উপাদানের প্রতি অমোঘ টানে, কক্ষপথচ্যুত হয় না কি ভাষা ? এই আপাত নিরপেক্ষ অমোঘ আকর্ষণ, যতটা বিশ্বজনীন, ততটাই আঞ্চলিক। যতটা অনর্থক, ততটাই আপন সাংস্কৃতিক বলয়ে ব্যক্তিগত অভিজ্ঞতায় অর্থপূর্ণ। এ কোনো কক্ষপথচ্যুতি নয়, অভিজ্ঞতার ব্যাপ্তি ও তীব্র কিছু সংবেদ এই অহৈতুকী টানকে অনায়াসে নিয়ে আসে চিহ্নিতকরণের ভীড়ে। মুখর হয়ে ওঠে মৌলিক উপাদান, অনুষঙ্গের সঙ্গে জড়িয়ে জড়িয়ে তারা হয়ে ওঠে একেকটা ব্যঞ্জনা, দ্যোতনা। হয়ে ওঠে ভাষা !

বাল্য বয়সের দুর্গাপুজোর স্মৃতিকথা লিখতে গিয়ে মনীন্দ্র গুপ্ত লিখছেন, "তবু আমাদের মন পড়ে আছে মণ্ডপে যেখানে কুমোরেরা তেঁতুল বিচি সেদ্ধ করে তার সাদা পাতলা আঠায় বাটিতে বাটিতে রং গুলছে। কী তাজা সেইসব দিশি রং ! দুর্গার গায়ে হলদে পাখীর গাঢ় হলুদ, অসুরের গায়ে পাতাল শৈবালের ঘন সবুজ, বিজয়ার গায়ে গোলাপী দোপাটির কুসুমরাগ, জয়ার গায়ে শ্বেতপদ্মের আভা, শাড়ি আর কাঁচুলির কাঁচা সবুজ, গভীর বেগুনী, ঘোর লাল, অপরাজিতা নীল – মূর্তির উপর কুমোরেরা তুলিতে তুলিতে ভরে এইসব রঙের পোঁচ দেয় আর আমি অবাক হয়ে দেখি, সাদা জমি যেন রঙের বিদ্যুতে ভরে উঠছে। সারি সারি মাটির সরায়, এনামেল বাটিতে কুমোরদের আঙুলে গোলা ঐ রং আমাকে জাগিয়ে দেয় — রঙের ঘন

Scanned with CamScanner

লাবণ্যের মধ্যে ক্রূরতা, পেলবতা, তেজ, অন্ধকার – যেন পাত্রে পাত্রে আদি বীজ টৈটুম্বুর হয়ে আছে। আমি পাগলের মতো বুড়ো কার্তিক কুমোরকে মিনতি করি, 'কারিগরমশাই, জয়ার শাড়িতে ঐ বেগুনী রংটা দাও।' – আমি কি অবচেতনায় চাই ঐ গভীর স্তন মোহের অন্ধকারে ডুবে থাকুক !' 'কারিগরমশায়, সাপের গায়ে ঐ গোলাপী রংটা দাও।' – আমি কি কল্পনা করি ঐ সাপ দুর্গার জঠর থেকে বেরিয়ে এসেছে, পিচ্ছিল, সদ্যনির্মোকহীন ! গাঢ় গোলাপীতেই সব চেয়ে তীব্র বিষ ! . . . "[২]

এ যেন মুখ ঘুরিয়ে গোড়ায় তাকানো। বাস্তবানুগ হতে হতে মুখ ঘুরিয়ে ছবির ভাষার বাস্তবতায় আসা। পাশ্চাত্যে 'abstract art' কথাটির সঙ্গে সঙ্গে তাই যখন 'language' কথাটিও ওতপ্রোত জড়িয়ে গেল, তখন বোঝা গেল যে একটা 'internal system', আভ্যন্তরীণ সম্বন্ধ'র কথা বলা হচ্ছে। কেবলই বাহ্যিক জগতকে উপলক্ষ্য না করে ভাষা তার নিজের ভেতরকার সম্পর্কগুলোই যখন মূল বিষয় বলে মনে করে। আর ঠিক এই মুহূর্তেই ধাক্কা খায়, নড়ে চড়ে ওঠে শিল্পীর মনের অতল। ১৮৮৫ সালে থিওকে লেখা একটি চিঠিতে ভ্যান গগ্ আন্তরিকভাবে বলার চেষ্টা করছেন এই বিকল্প পথটা – 'Always and intelligently to make use of the beautiful tones which the colours form of their own accord, when one breaks them on the palette, I repeat – to start from one's palette, from one's knowledge of colour-harmony, is quite different from following nature mechanically and obsequiously.

Here is another example : suppose I have to paint an autumn lanscape, trees with yellow leaves. All right – when I conceive it as a symphony in yellow, what does it matter whether the fundamental colour of yellow is the same as that of the leaves or not ? It matters very little.'[৩]

শুধু ভ্যান গগের কাছে কেন ? খোদ যুরোপেই গথিক শিল্পে ও তার আগে বাইজানটাইন শিল্পে, মিশরীয় শিল্পে, ভারতবর্ষে প্রাচীন ভাস্কর্যে ও চিত্রকলায়, চীন

---

[২] মনীন্দ্র গুপ্ত, *অক্ষয় মালবেরি*, পরমা, ১৯৯৫

[৩] Mark Roskill (Ed.), *The Letters of Vincent Van Gogh*, Flamingo, 1983.

ও জাপানের শিল্পে – সর্বত্রই দেখি রঙ-রেখা-দেশের আন্তর্সম্পর্ক জাগিয়ে তোলা হচ্ছে স্বনির্ভরভাবে, বাহ্যিক ও প্রত্যক্ষ জগতকে কতটা সরাসরি ফুটিয়ে তোলা যায় সেটা ' . . . matters very little'.

প্রত্যক্ষ জগতকে প্রকাশ করা, নাকি ছবির ভাষার মৌলিক উপাদানগুলোকেই প্রত্যক্ষ করে তোলা স্বাধীনরূপে, এই প্রতিবিরোধী অবস্থান থেকে অনেকটা দূরে, কোনো তৃতীয় অবস্থানের সম্ভাবনা আছে কিনা, এই অনুসন্ধানে আমরা বারবার ফিরে আসি ভারতীয় শিল্পের দীর্ঘ ইতিহাসে, চৈনিক ও জাপানী পরম্পরায় এবং লোকশিল্পের নানান ধারায়।

লোকশিল্পের কথাই যদি ওঠে, মধ্যপ্রদেশের বাস্তার অঞ্চলের ঢোকরা মূর্তিগুলোতে দেখা যায় সেরকমই এক সংশ্লেষ। অধিকাংশ ঢোকরা কাজে দেখা যায়, হাতির কান ও শুঁড়, অথবা পাখির লেজ, অথবা কচ্ছপের বর্ম ইত্যাদি বোঝাতে কোনো বাস্তবানুগ রূপে না গিয়ে শিল্পীরা তৈরি করছেন কতকগুলো লাগসই নকসা। সরু-মোটা রেখায় তৈরি নকসা। সেসব নকসার আছে এক স্বাধীন উপস্থিতি, যেন তারা জন্মেছে নকসা হিসেবেই। অথচ, হাতির কানে কি পাখির লেজে সেইসব নকসা এসে পড়া মাত্রই তারা কান অথবা লেজেরও পরিচয় বহন করতে থাকে। বিমূর্ততা ও চিহ্নিতকরণের মধ্যে এক সাবলীল সমঝোতা হয়।

মাথায় কলসী, এক গ্রাম্য নারী মূর্তি, বাঁ হাত ঝুলছে শরীরের পাশে, ডান হাত দিয়ে কলসীটা ধরে রাখা। এই ঢোকরা কাজটিতে বাস্তবনিষ্ঠতা চোখে পড়ার মতো। বাস্তবানুগ কোনো ব্যাকরণ নেই এখানে কিন্তু পর্যবেক্ষণের বাইরে থেকে নিয়ে আসা কোনো উপাদানও নেই। কেবল খটকা লাগে কলসী ধরে রাখা ওই ডান হাতটা দেখে। এই হাতটাই যেন একমাত্র অংশ যা পর্যবেক্ষণের ধার ধারেনি। কাঁধ থেকে বেরিয়ে অনেকটা পাশে এগিয়ে তবেই কনুইয়ে বাঁক খেয়ে, ফের একটা জ্যান্ত গাছের ডালের মতো লকলক করে অনেকটা ওপরে উঠে গিয়ে আঁকড়ে ধরেছে কলসীর কানা। অত্যন্ত স্বাধীনভাবে, সাহসের সঙ্গে বাড়িয়ে দেওয়া হল হাতটার মাপ। যেহেতু বাকি মূর্তিতে এই লম্বাটে গড়নটা বিদ্যমান, তাই ওই ডান হাতের অতি প্রলম্বিত মাপটা আপাতভাবে অস্বাভাবিক লাগে না। কেবল অবাক লাগে এই রূপচিন্তার মধ্যে নিহিত স্বাধীন প্রবণতাকে অনুভব করে। আরো অবাক লাগে এর

Scanned with CamScanner

স্বাভাবিক, যেন কিছুই হয়নি ভাবখানি দেখে। সত্যিই তো কিছুই হয়নি – ডান হাতটা যে বাড়াবাড়ি রকমের লম্বা হয়ে গেল তার উদ্দেশ্য তো খামখেয়ালী নয়, তার উদ্দেশ্য হল ওই কলসীটাকে ধরতে পারা। লম্বা গলা, লম্বা মুখের জন্যে কলসীটাই তো চলে গেছে স্বাভাবিক নাগালের বাইরে। অতএব লম্বাটে গড়নের সঙ্গে পাল্লা দেওয়া, অতএব হাতটার স্বাধীন হয়ে ওঠা !

এ ধরণের শিল্প ভাষায় শিল্পীর স্বাধীন হাতটাকে যে ক্রমশ সাহসী হয়ে উঠতে দেখি, তার পেছনে মাধ্যম ও করণকৌশলের গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা অনস্বীকার্য। ঢোকরার ক্ষেত্রে যেমন, মাটির আকৃতির ওপর মোম দিয়ে বস্তুর রূপায়ণ ও শেষ পর্যন্ত গলন্ত ধাতু দিয়ে ঢালাই করা – এই পদ্ধতি অনেকটাই ঢোকরার ব্যাকরণের সহায়ক। অজস্র রেখার ভীড় এই ঢোকরা মাধ্যমের গুণ, তার অবদান। মহাবলীপুরমের ইশারাপূর্ণ মূর্তিভাষা যেমন অনেকটাই ওই অঞ্চলের গ্রানাইট পাথরের অবদান। মহাবলীপুরম জুড়ে ছড়িয়ে ছিটিয়ে থাকা ছোটো বড় নানা মাপের গ্রানাইট পাথর, পাহাড়, বোল্ডার নিজেরাই যেন আশ্চর্য সব ভাস্কর্য। কোনো কোনো পাথর-পাহাড় দেখে এটাও মনে হওয়া অস্বাভাবিক নয় যে হয়তো এগুলো প্রাকৃতিক নয়, মানুষের হাতের স্পর্শ ঘটেছে, পাথর গাত্রে এতরকম রূপাবয়বের ইঙ্গিত যেন সেই সব ছেনী হাতুড়ির স্পর্শের পরিণাম। যেন কাজ সম্পূর্ণ না করে ওই অবস্থায় ছেড়ে দিয়ে চলে গেছেন শিল্পীর দল। আসলে উল্টোটাই ঠিক ! ঠিক ওই জায়গা থেকেই শুরু করেছেন শিল্পীর দল ! ঠিক যেখানে যেখানে, প্রস্তর খণ্ডে, পাহাড় গাত্রে, গুহার দেওয়ালে, শিল্পীরা টের পেয়েছেন অসম্পূর্ণ অথচ অবিরত ইশারা, ঠিক সেখানে সেখানেই ছেনীর ধাক্কা মেরেছেন তারা। ফুটিয়ে তুলেছেন তাদের ইপ্সিত রচনা, পুরাণকাহিনী, দেবমূর্তি, প্রকৃতির নানান অনুপুঙ্খ।

মহাবলীপুরমের ভাস্কর্যে বিমূর্ততার যে প্রয়োগ দেখা যায় তা যতটা না রূপের বা উপস্থাপনের তার চেয়েও বেশী ওই পাথরের চরিত্রের। পাথর থেকে চোখ তুলে মহাবলীপুরমের প্রকৃতি, আকাশ-বাতাস; ভূ-প্রকৃতি, শান্ত অথচ উত্তাল সমুদ্র, এমনকি প্রাচীন মন্দিরগুলোর বর্তমান ক্ষয়িষ্ণু চেহারার দিকে তাকালে এও টের পাওয়া যায় যে মহাবলীপুরমের ভাস্কর্য-ভাষা সেই জায়গার গোটা পরিবেশের ভাষা। সমগ্র পরিবেশে যে ক্রমশ লড়াই করতে করতে, নিজেকে ধ্বস্ত হতে দিয়ে, ক্ষয়ের মধ্যে রূপায়িত হতে হতে যে বেঁচে থাকার লড়াই, যে জৈবিক আন্দোলন –

Scanned with CamScanner

মহাবলীপুরমের ভাস্কর্যের শৈলী ও ভাষা ঠিক তাই। এখানকার মূর্তিকলায়, বিশেষ করে রিলিফ ভাস্কর্যে মাঝে মাঝেই যে বিমূর্ত আকার-আকৃতি দেখা যায়, তা কেবল বিমূর্ত থাকার ইচ্ছায় নয়, জৈবিক গতিটাকে প্রকাশ করার জন্য। এখানে বিমূর্ততা যেন এক প্রকাশ ভঙ্গী, পাথরের ভাষা ও মূর্তির ভাষার যে ঈঙ্গিতময়তা, যে জৈবিক অনুরণন – তার প্রকাশ ভঙ্গী। বিমূর্ততার একাধিক দায়িত্ব, 'ক্রমশ হয়ে ওঠার' স্পন্দন তৈরী করা, অসম্পূর্ণতাকে মূর্ত করে তোলা, এবং পাথরের অতীত ও মূর্তির বর্তমানের সঙ্গে সঙ্গে রূপের ভবিষ্যতকে ইঙ্গিত করা। ভাবী অস্তিত্বের বীজ বপন করা। এবং তাকে সম্পূর্ণতায় পাওয়ার দায়িত্ব, দর্শকের।

অস্তিত্বের ব্যঞ্জনা তৈরী করা, অনুভবে সম্পৃক্ত করে তোলা একটি ছবিকে, মুখ-অঙ্গভঙ্গি অভিব্যক্তি ব্যাতিরেকে, – এ ধরণের দৃষ্টান্ত যথেষ্ট পাওয়া যায় ভারতীয় চিত্রে বা মিনিয়েচার পেইন্টিং-এ। টকটকে লাল রঙের প্রেক্ষাপটে বৃন্দাবনের অরণ্যে গোপী পরিবৃত কৃষ্ণ, ছবির বাঁ পাশে দেখা যাচ্ছে রাধা চলেছে কৃষ্ণেরই খোঁজে। এই দুই অংশের মধ্যে যে যোজন দূরত্ব, দুটো যে আলাদা স্থান, এই পার্থক্য বোঝানোর জন্য এই দুই অংশের মাঝে কেবল একটি লম্বা গাছ। এই গাছটি একাধারে বিভাজক ও যোগাযোগ সূত্র। এই গাছটি কোনো বিমূর্ত রূপ নয়, কিন্তু যথাস্থানে তাকে বসিয়ে যে কাজটি করানো হল, সেটা কোনো বাস্তবানুগ নিয়ম মেনে নয়। বলতে পারা যায় 'arbitrary', অহৈতুক, অথচ অব্যর্থ। অবাস্তবানুগ বা 'non-realistic' শিল্পে, যেমন ষোড়শ শতাব্দীর এই 'গীত-গোবিন্দ' ছবিটিতে, আকছার দেখা যায় এ ধরণের অহৈতুকী প্রয়োগ। ওই গাছটির মাধ্যমে শুধু যে দুটো আলাদা জায়গা বা 'space' বোঝানো গেল তা নয়, দুটো পৃথক মানসিকতাও চিহ্নিত হল। একদিকে আপন লীলায় মগ্ন কৃষ্ণ, অন্যদিকে উৎকণ্ঠিত রাধা। এই পার্থক্যকে ব্যঞ্জনাময় করে তুলছে, দুটো রঙের বিমূর্ত অবস্থান। আগেই উল্লেখ করা হয়েছে ঘন আবেগ সঞ্জিত লালের মধ্যে কৃষ্ণের অস্তিত্ব এবং রাধাকে নিবিড়ভাবে ঘিরে আছে নীল রং। ওই লাল বা নীল, কোনোটাই কোনো কিছুর প্রত্যক্ষ উপস্থাপন নয়, আকাশ, অরণ্য, জমি কিচ্ছু নয়। তারা দুটো ভিন্ন মানসিক অবস্থানের বিমূর্ত পরিচায়ক। আবেগময় লীলার প্রতীক যেন ওই লাল, ওপর দিকে নীল যে কৃষ্ণের প্রতীক, রাধা যে উৎকণ্ঠিত কৃষ্ণের চিন্তায়, নীল যেন সেই বিভোরতারই ইঙ্গিত।

Scanned with CamScanner

এই ভাষার, এই বিমূর্ত ব্যঞ্জনার অস্তিত্ব অনেকটাই নির্ভর করে তাকে পড়তে পারার সার্থকতায়। বাস্তবানুগ চিত্রভাষার প্রত্যাশা থেকে নিজেকে মুক্ত করার সার্থকতায়। অথচ এই বিমূর্ততা কোনো দুর্বোধ্যতার সমার্থক নয়। এই বিমূর্ততা ও তার চলন আমাদের প্রতিদিনের যাপনের মধ্যে। স্বতস্ফূর্ততায় সেটা প্রকাশ হয়ে পড়ে ছোটোদের ছবিতে, লোকশিল্পে, আজও। এই স্বতস্ফূর্ততার শরিক হওয়া সম্ভব তখনই, যখন রসিক দর্শক নিজেও দেখতে পাবেন এই অভিমুখ, শিল্পকলার মধ্যে। যখন তিনিও মুখ ঘুরিয়ে গোড়ায় তাকিয়ে নেবেন, একটিবার। নচেৎ প্রয়োজন একটা তাত্ত্বিক কাঠামোর, প্রয়োজন অহং ভাঙার একটা আয়োজনের।



তবু মনে রেখো : স্মৃতি ও বাঙালির পাবলিক কালচার

দীপেশ চক্রবর্তী

পাবলিক কালচার কথাটি গত পনেরো-বিশ বছর যাবৎ ইংরিজিতে চালু হয়েছে। তার সঠিক বাংলা কী হবে তাই নিয়ে তর্কে যেতে চাই না। এই স্বল্প-পরিসর প্রবন্ধের জন্য একটি সহজ সংজ্ঞা তৈরি করে নিয়ে এগোই। ধরে নিই যে "পাবলিক কালচার" বলতে যে সাংস্কৃতিক পরিমণ্ডলটি বোঝায় তার সঙ্গে আধুনিক মিডিয়া – ছাপাখানা, রেকর্ডের গান থেকে শুরু করে সিনেমা-ইন্টারনেট ইত্যাদির একটা যোগাযোগ আছে। অর্থাৎ "পাবলিক কালচার" প্রধানতঃ শহুরে ও আধুনিক যন্ত্র সভ্যতার সঙ্গে সম্পর্কিত। সমস্ত শ্রেণীর মানুষেরই "পাবলিক কালচার" হতে পারে। গরীব-গুর্বো, পাড়ার মস্তান, তারকেশ্বর-যাত্রী "ভোলে বাবা"র চ্যালারা– এঁদের সবাইকে নিয়েই "পাবলিক কালচার"–এর আলোচনা হতে পারে। আমার আলোচনা কিন্তু যে শ্রেণীটিকে আমি সবচেয়ে বেশি চিনি, সেই তথাকথিত ভদ্রলোক সমাজ নিয়ে। অর্থাৎ, এই প্রবন্ধের আলোচনার জন্য ধরে নেবো যে গত দুশ বছর ধরে বাঙালি শিক্ষিত মধ্যবিত্ত মানুষ যেভাবে তাঁদের নিজেদের প্রয়োজনে একটি জন বা সমষ্টিগত জীবনের আয়োজন করেছেন, তাই "পাবলিক কালচার।" এঁরা নিশ্চয়ই সংখ্যায় মুষ্টিমেয় ও এঁদের সামাজিক প্রাধান্য বা নেতৃত্ব আজ অচল। কিন্তু এঁদের কথাই বলছি। সামাজিক স্মৃতি ও পাবলিক কালচারের সম্পর্ক নিয়ে আলোচনা করতে চাই, যেখানে এঁদের ইতিহাসের উপাদান আমাকে কয়েকটি বিষয় ভাবতে সাহায্য করে।

শিক্ষিত বাঙালির যে "পাবলিক কালচার" তার একটি বিরাট অংশ জুড়ে আছে ঐতিহ্যের চেতনা বা স্মৃতিচর্চা। বহু কৃতী মানুষের স্মৃতি নিয়ে বাঙালির একটি আধুনিক ঐতিহ্যবোধ গড়ে উঠেছে বলা যায়। আমরা কীভাবে জনজীবনে স্মৃতিচর্চা করি, সে বিষয়ে দুই-একটি কথা বলাই আমার উদ্দেশ্য।

পশ্চিমের যে পাবলিক কালচার, সেখানে ব্যক্তি-মানুষের স্মৃতির আলোচনার মূল অবলম্বন তথ্যবহুল জীবনী বা কখনো কখনো জীবনীভিত্তিক ইতিহাস। জীবনীগ্রন্থ যে কতো জনপ্রিয় তা পশ্চিমি বিমানবন্দরের বই-এর দোকান দেখলে

বোঝা যায়। অনেক সময় দোকানের একটি অংশে আলাদা করে লেখা থাকে : Biography। আধুনিক জীবনীগ্রন্থ বলতে বোঝায় একটি মানুষকে সম্পূর্ণভাবে দেখার চেষ্টা। দলিল-তথ্যাদি ঘেঁটে তাঁর জীবন সম্বন্ধে ঐতিহাসিক সত্যে পৌঁছানোর প্রয়াস। আমাদের দেশে কিছু পুণ্যপুরুষের জীবনী ব্রিটিশ আমলের আগে রচনা হতো, তা আমরা সবাই জানি। সেই সব গ্রন্থের উদ্দেশ্য অনেকটাই ছিল মানুষগুলির ঐশী ক্ষমতার কীর্তন ও প্রচার। সাধারণ বা নিতান্তই মর্ত্যবাসী মানুষের জীবনী আমরা প্রধানতঃ ইংরেজ আসার পর-ই লিখেছি। প্রভাতকুমার মুখোপাধ্যায় বা সম্প্রতি প্রশান্তকুমার পাল ও অন্যান্যদের চেষ্টায় সে ধারা পুষ্টিতও হয়েছে।

কিন্তু পাশ্চাত্যের সঙ্গে আমাদের স্মৃতিচর্চার একটি মূল পার্থক্য চোখে পড়ে। ওঁরা যেখানে মানুষের স্মৃতি ধরে রাখতে চেষ্টিত হন প্রামাণ্য ইতিহাসের মাধ্যমে, আমাদের স্মৃতির – জীবনীগ্রন্থের নয় – মূল উপাদান কিন্ত গল্প। গল্প বলতে ইংরিজিতে যাকে বলে anecdotes বা ছোট, ভাঙা বা ভগ্নাংশ কাহিনী আমি তারই কথা বলছি। পশ্চিমি জীবনীর মধ্যেও গল্প থাকে নিশ্চয়ই। কিন্তু যেহেতু সেই সব ছোট ছোট কাহিনীগুলো জীবনীগ্রন্থের মূল সুতোয় বাঁধা, তাই তারা anecdote-র চরিত্র হারিয়ে খানিকটা 'case study'-র রূপ পরিগ্রহণ করে। সেখানে প্রতিটি ছোট ছোট গল্প একটি পূর্ণাঙ্গ জীবনী বা তার কোনো পরিচ্ছেদের মূল বক্তব্যটিকে সমর্থন করে ঐ বৃহৎ বক্তব্যেরই প্রতিনিধিত্ব করে যেন।

আমাদের স্মৃতির বাহন যে anecdote, সেই ছোট ছোট ভাঙা-চোরা গল্প জুড়ে জুড়ে কিন্তু কোনো বড় যুক্তি বা বক্তব্য দাঁড়ায় না। আর তা তার উদ্দেশ্যও নয়। হয়তো একটি মানুষের একটি বিশেষ কোনো দিক উদ্‌ভাসিত হয়, কিন্তু ঐ পর্যন্তই। উদাহরণের শেষ নেই। লেখক কমলকুমার মজুমদার বা কবি শক্তি চট্টোপাধ্যায়ের মৃত্যুর পর যে সব বই প্রকাশিত হয়েছিল বা হয়েছে, তাদের বেশির ভাগের স্মৃতি চিত্রণের মাধ্যমই কিছু ছোট ছোট, টুকরো টুকরো গল্প। গায়ক দেবব্রত বিশ্বাসের জীবন নিয়ে বিবেক গুহ ও চন্দন দাশশর্মার সম্পাদনায় "জর্জ বিশ্বাস" নামে যে পুস্তকটি প্রকাশিত হয় (কলকাতা, এ মুখার্জী অ্যান্ড কোঃ প্রাঃ লিঃ, ১৯৯৯), তার অর্ধেকই এইরকম গল্পে ভরা। শুধু সাম্প্রতিক কালের কথাই নয়। উনিশ শতকের বা বিশশতকের অনেক জাতীয় স্মৃতিই কি এইরকম গল্পের সমষ্টি

Scanned with CamScanner

নয় ? বিপিনবিহারী গুপ্তের "পুরাতন প্রসঙ্গ" বইখানি তো এইরকম একটি গল্প-সংকলন। বিদ্যাসাগর কি স্যার আশুতোষের মত ঐতিহাসিক পুরুষদের আমরা অনেকখানিই মনে রাখি গল্পে। কবে কোন সাহেবের অশিষ্ট ব্যবহারে অপসারিত হয়ে পরে চটিশুদ্ধ পা দুখানি টেবিলে তুলে তার শোধ তুলেছিলেন বিদ্যাসাগর, কিম্বা স্যার আশুতোষ কবে এক সাহেবের জাতি বৈরিতায় বিরক্ত হয়ে তাঁর কোট ছুঁড়ে ফেলে দিয়েছিলেন চলন্ত ট্রেন থেকে – আমাদের অতীতবোধ স্কুলজীবন থেকেই সঞ্চারিত হতো এই সব গল্পের উত্তেজনায়।

গল্প গুলো ছাপার অক্ষরে আমাদের কাছে এলেও, এই গল্পে-গল্পে মানুষকে মনে রাখার অভ্যাসটি ইংরিজিতে যাকে বলে 'oral culture' বা মৌখিক সংস্কৃতি তারই অংশ বলে মনে হয় আমার। মধ্যবিত্ত পরিবারগুলোর নিজস্ব স্মৃতির মাধ্যমই ছিল এই মুখে-মুখে বলা গল্প। যাঁদের দেখিনি – পিতামহ, এক জ্যাঠামশাই, এক অকালমৃতা পিসীমা – আমার জন্মের বহু আগেই যাঁরা পৃথিবী থেকে বিদায় নিয়েছিলেন – তাঁদের সম্বন্ধে আমার স্মৃতির ঝুড়ি ঝাড়লে দুএকটি গল্পের বেশি আর কিছুই বেরুবে না। পিতামহ ভুগোল ক্লাসের শিক্ষক হিসেবে কবে নাকি এক সাহেব পরিদর্শককে বৃদ্ধাঙ্গুষ্ঠ দেখিয়ে বাঙাল অঙ্গভঙ্গিমার সঙ্গে ইংরিজিতে বলেছিলেন, "You know this of geography", জ্যাঠামশাই কেন ত্রিশের দশকের সাম্প্রদায়িক রোদেয়াদের ক্ষুব্ধ ও হতাশ করে কংগ্রেস ত্যাগ করে মালব্যজীর কংগ্রেস ন্যাশনালিস্ট পার্টির সক্রিয় সদস্য হন, এম. এ. পাঠরতা পিসীমা পিতামহীর ওপর অভিমান করে গঙ্গায় ডুবে আত্মহত্যা করেছিলেন কি করেননি – এইসব অনিশ্চিত গল্পের ওপরই দাঁড়িয়ে আছে (অন্যান্য বাঙালির মত) আমারও পারিবারিক স্মৃতি। দলিল-দস্তাবেজ সামান্যই : পিতামহর একটি ছবি ও সই ; জ্যাঠামশাই -এর একটি ছবি ও কিছু কাগজপত্র, পিসীমার কিছু বাংলা সাহিত্যের বই ও নিজস্ব নোট-সম্বলিত এক কপি অলিভার গোল্ড স্মিথের The Deserted Village। ছবি দলিল মিশিয়ে যে খণ্ড ইতিহাসের আমি উত্তরাধিকারী, তা কিন্তু তাৎপর্য পায় ঐ গল্পগুলির মাধ্যমেই।

Ancedote নির্ভর অতীতবোধ তাকে আমরা ইতিহাস চেতনার বিরোধীই বলতে পারি। ইতিহাস রচনায় অতীত সম্বন্ধে একটি দূরত্ববোধ থাকে। অতীত গত,

Scanned with CamScanner

তাকে আর নতুন করে উজ্জীবিত করা যায় না, দলিল ঘেঁটে ঐতিহাসিকের যুক্তি দিয়ে সত্যাসত্য বিচার করে তিল তিল করে তাকে নির্মাণ করে তুলতে হয়। ইতিহাস রচনায় অতীতের অঙ্গহানি যতো কম হয়, ততোই তা ভালো ইতিহাস। Anecdotes আদৌ সেইরকম নয়। অতীত যে একটি দূর অগম্য দেশ, খণ্ড-কাহিনীগুলোতে সেই বোধ থাকে না। বরং স্যর আশুতোষের গল্প পড়তে গিয়ে আমরা যেন স্যর আশুতোষেরই পাশে দাঁড়িয়ে পাজি সাহেবটির জব্দ হওয়া মুখখানি কল্পনা করে পুলকিত হই। গল্পে বিদ্যাসাগর, বঙ্কিম, রবীন্দ্রনাথ সব জীবন্ত হয়ে ফিরে আসেন। বাঙালী বিদ্বজনের মধ্যে বুনো রামনাথ, ভারতচন্দ্র থেকে শুরু করে উনিশ-বিশ শতকের নানান মানুষের গল্প-রসিকতা এমন মুখে মুখে ফেরে যে অতীতকে সমসাময়িক ভাবতে অসুবিধে হয় না। কমলকুমার মজুমদার একবার তাঁর সংকলিত উনিশ-শতকী রসিকতা "ঈশ্বর কোটির রঙ্গকৌতুক" বলে পুস্তকাকারে ছাপিয়েছিলেন। একবার বই পড়া হয়ে গেলে সে গল্পগুলি আবার আড্ডায় মুখে-মুখে চালু হতো। আমি মাঝে মাঝেই প্রেসিডেন্সি কলেজে ইংরিজির সাহিত্য পড়ানোর ধারার কথা ভাবি। বিশেষ গবেষণা হয়নি এ নিয়ে। গবেষণাধর্মী কোনো বই – এ বিষয়ে – অন্ততঃ আমার নজরে আসেনি। অথচ ক্যাপ্টেন ডি.এল. রিচার্ডসন থেকে সুরু করে প্রফুল্ল ঘোষ, পার্সিভ্যান সাহেব, তারক সেন, সুবোধ সেনগুপ্ত, অমল ভট্টাচার্য, মায় অরুণ দাশগুপ্ত পর্যন্ত উজ্জ্বল হয়ে আছেন ছাত্র-মাস্টারদের বলা অজস্র খণ্ড কাহিনীতে। এ গল্পগুলি কতগুলো ছাপা হয়েছে, কতগুলো হয়নি। প্রেসিডেন্সি কলেজের প্রতিষ্ঠানিক স্মৃতি তো অনেকটাই এইরকম গল্প।

পারিবারিক স্মৃতিও গল্প - আগেই সে-কথা বলেছি - কিন্তু জনজীবনে বা পাবলিক কালচারে তার চেহারাটা একটু অন্য রকম। তার মূল উপজীব্য বংশকীর্তি বা বংশগৌরব। নগেন বসু মশাই এক সময় এইরকম একটি বংশ মাহাত্ম্য সংকলনকেই "বঙ্গের জাতীয় ইতিহাস" নামে ছাপিয়ে ছিলেন। সে নয় আজ প্রায় সত্তর আশি একশো বছর আগের কথা। কিন্তু সেই ট্র্যাডিশন এখনো ফুরিয়ে যায়নি। সম্প্রতি প্রকাশিত একটি বই-এর উদাহরণ দিই। অলক মিত্রের তোলা কিছু চমৎকার ছবি ও দেবাশিস বন্দ্যোপাধ্যায়ের সুপাঠ্য রচনা নিয়ে প্রকাশিত হয়েছে একটি কৌতুহলোদ্দীপক বই, "বনেদি কলকাতার ঘরবাড়ি" (আনন্দ : ২০০২)।

Scanned with CamScanner

ভালো বই, পড়তে ভালো লাগে। কিছু রচনায় যে স্মৃতির ছাপ, তা বংশগৌরবেরই স্মৃতি। পড়লে মনে হবে বাড়িগুলোর ইতিহাস যেন বংশমাহাত্ম্যেরই ইতিহাস। স্থাপত্যের ইতিহাস হতে পারতো এই বই। পথ-ঘাটের ইতিহাসও হতে পারতো। শহর গড়ে ওঠার যে প্রক্রিয়া তারও ঐতিহাসিক সাক্ষ্য বহন করে আলোচিত ইমারতগুলি। বা এই বইতেই পাওয়া যায় "হেস্টিংস হাউস" প্রসঙ্গে সম্পূর্ণ অন্য এক স্বাদের গল্প – ভূতের গল্প :

> পূর্বতন কর্মচারীরা নাকি দেখেছেন, চার ঘোড়ার ফিটনে চেপে গভীর রাতে গভর্নর জেনারেল হেস্টিংস এই বাড়িতে আসেন। বাড়ির ভেতরে ঢুকে কী যেন খুঁজে বেড়ান। (পৃঃ ৮৩)

কিন্তু এ-সব দিকে যাননি শ্রীমিত্র ও শ্রীবন্দ্যোপাধ্যায়। তাঁরা ভূমিকাতেই বলেছেন : "স্থাপত্যের বহিরঙ্গের সৌন্দর্যই তার একমাত্র পরিচয় নয়। তার ভেতরের মানুষজনের ইতিহাস, জীবনচর্যা ও সংস্কৃতি এই স্থাপত্যেরই অঙ্গ। তাই প্রাসঙ্গিকভাবেই এসেছে বনেদি কলকাতার মানুষজনের কথা।" এই "মানুষজনের কথা"ও কিন্তু বংশের ইতিহাস না হতে পারতো। প্রভু-ভৃত্যের বা স্ত্রী-পুরুষ সম্পর্কের আলোচনা হতে পারতো, বনেদি বাড়ির অন্দরমহলের আসবাবপত্র ও তার রুচির ইতিহাসের আলোচনাও হতে পারতো। হয়নি যে, তা নিয়ে আমি অভিযোগ করছি না। আমি বলতে চাই আমাদের জাতীয় অভ্যাসে এটাই স্বাভাবিক যে বাড়ির ইতিহাসও হয়ে দাঁড়াবে বংশগৌরবের গল্প : "কলকাতার প্রত্যেকটি বনেদি পরিবারের আচার-আচরণ, শখ, শিক্ষা ও সমৃদ্ধির ইতিবৃত্ত স্বকীয় বৈশিষ্ট্যে উজ্জ্বল।" (ভূমিকা)। এই বইতে বংশগৌরব বা মহিমার কথা কীভাবে এসেছে তা দুটি উদাহরণ – আরো অজস্র দেওয়া যেত - দিলেই পরিষ্কার হবে।

"চোরবাগানের মিত্রবাড়ি" সম্বন্ধে পড়ি :

> "এঁদের পরিবারে ব্যারিস্টার, অ্যাডভোকেট, ডাক্তার, এঞ্জিনিয়ার, ব্যাঙ্ক ম্যানেজার প্রভৃতি জীবিকার অনেকেই আছেন। প্রয়াত গৌরীনাথ মিত্র ছিলেন একদা রাজ্যের অ্যাডভোকেট জেনারেল। . . . পূর্বাঞ্চলীয় রণজি ট্রফি ম্যাচে বিজয়ী রাজ্যকে যে মোনা মিত্র মেমোরিয়াল চ্যালেঞ্জ কাপ

Scanned with CamScanner

দেওয়া হয়, সেই মোনা মিত্র এ বাড়িরই ছেলে।" (পৃঃ-৫)

অন্যত্র টালিগঞ্জের "বাওয়ালি মণ্ডলবাড়ি" সম্বন্ধে লেখকেরা বলছেন :

> "মণ্ডলদের বংশধর চন্দ্রদীপবাবুর কাছে দেখেছিলাম একটি আশ্চর্য জিনিস। ধানের সাইজের একটি সোনার মাদুলি। এই মাদুলির ভেতরে আছে লক্ষ ব্রাহ্মণের পদধূলি। মণ্ডলবাড়িতে একদা কোনও এক অনুষ্ঠানে লক্ষ ব্রাহ্মণের সমাগম ঘটেছিল। সেদিন তাঁদের পদধূলি সযত্নে সংগ্রহ করে রাখা হয়েছিল। তারই কয়েকটি কণা চন্দ্রদীপবাবুর মাদুলিতে।" (পৃঃ ৬৩)

এই "একদা", "কয়েকটি কণা", "লক্ষ ব্রাহ্মণ", "কোনও এক" প্রভৃতি শব্দবন্ধ থেকে স্পষ্টই বোঝা যায় এই অতীত কোনো তথ্যমূলক ইতিহাসের বিষয়বস্তু নয়। এটি একটি পারিবারিক "গল্প"ই, অর্থাৎ আমার অর্থে anecdote।

এই পারিবারিক গল্পের বাচনভঙ্গির বয়স অনেক। এবং আমাদের মনের অনেক গভীরে এর শিকড় প্রোথিত। ঐতিহাসিক রমেশ মজুমদার - আপনারা অনেকেই জানবেন - তাঁর যৌবনে কুলজীগ্রন্থের ঐতিহাসিকতার বিরুদ্ধে বিদ্রোহ করেছিলেন। বলেছিলেন, এগুলি মোটেই ইতিহাসরচনার নির্ভরযোগ্য তথ্যের আকর নয়। অথচ তাঁর আত্মজীবনীমূলক স্মৃতিরচনার শুরুই বংশপরিচয় দিয়ে। সুনীতি চট্টোপাধ্যায়ের আত্মজীবনীতেও গোড়াতেই পড়ি এক পিসীমার কথা, যিনি তাঁকে বংশের মহিমা সম্বন্ধে সচেতন করে দিয়েছিলেন। মধ্যযুগের কবিরা বংশপরিচয় দিয়ে আত্মপরিচয় শুরু করতেন, এও সকলেরই জানা তথ্য। অনুমান করি যে যে সব নরসুন্দর এককালে ঘটকালির ব্যবসা করে বাড়ি-বাড়ি গিয়ে পাত্র-পাত্রীর বংশের গৌরব কীর্তন করতেন, আজকের বংশ-পরিচয়ের প্রথা তারই একটি আধুনিক রূপ। আমি নিজে যতোটুকু বিয়ের বাজারে বাঙালির "সম্বন্ধনির্ণয়" প্রক্রিয়াটি দেখেছি, তাতেও এক ধরণের পারিবারিক গৌরবগাথাই কীর্তিত হতে দেখেছি : "আমাদের বংশের অমুকে তমুক ছিলেন" এই ধরণের কথাবার্তাই হতো।

আমার অন্যতম বক্তব্য তাহলে এই যে শিক্ষিত বাঙালি ভদ্রলোকের "পাবলিক কালচার"-এ যে স্মৃতিচর্চার ওপর নির্ভর করে বাঙালির অতীত বা ঐতিহ্যবোধের সৃষ্টি হয় তার মূলে পাশ্চাত্য প্রভাবিত জীবনীগ্রন্থ বা ইতিহাসের চেয়েও বেশি কাজ

Scanned with CamScanner

করে ব্যক্তি-মানুষ ও পারিবারিক গৌরব সম্বন্ধে খণ্ড-কাহিনীর বা anecdote-এর সৃষ্টি ও প্রচার করার প্রবণতা। প্রবণতাটি আজও বর্তমান ও আমাদের সমষ্টিগত দৈনন্দিন অভ্যাসের অংশ।

এই বক্তব্য থেকে তিনটি উপপাদ্য বর্তায়। সেগুলো লিখে এই ছোট প্রবন্ধের ইতি টানি।

প্রথম উপপাদ্যটি এই : গল্প বা খণ্ডকাহিনীই যদি ব্যক্তি-মানুষকে স্মরণ করার ও বংশ-কাহিনীই যদি পারিবারিক স্মৃতির উপায় হয়, তাহলে বলতে হবে যে আমাদের স্মৃতির ইতিহাসে ছাপার অক্ষরে কালচার ও মুখে-মুখে গল্প করার কালচারে কোনো মৌলিক বিরোধ নেই। পাশ্চাত্যের আলোচনা যতো সহজে orality ও literacy দুটি আলাদা সামাজিক ধারা হয়ে যায়, আমাদের তা হয়নি। আমরা মুখে-মুখে ফেরা গল্পগুলোকেই কখনো ছাপার অক্ষরের মর্যাদা দিই, কখনো বা ছাপায়-পড়া গল্পই আবার মানুষের মুখে-মুখে ফিরতে থাকে। শান্তিনিকেতনের কথাই ধরুন। জায়গাটির সম্বন্ধে শিক্ষিত বাঙালির অনুভব তো বেশির ভাগই গড়ে উঠেছে আশ্রমবাসী ছাত্র-শিক্ষক কর্মীদের অজস্র গল্পে। যে গল্প কখনো লিখিত রূপ পেয়েছে, যেমন সুধীরঞ্জন দাশ, অমিতা সেন, প্রমথনাথ বিশী, জসিমুদ্দীন, বিনোদবিহারী মুখোপাধ্যায় ও অন্যান্যদের স্মৃতিচিত্রে। কখনো কখনো মুখে-মুখেই ঘুরেছে সেই গল্প। রামকিংকর বেইজ সম্বন্ধে নানা কাহিনী তো একদিন কলকাতায় বড় হতে-হতেই শুনেছি। হয়তো কোনো একদিন তার গ্রন্থিতরূপ দেখতে পাবো !

আমার দ্বিতীয় উপপাদ্য এই যে গল্প-বলার ঐতিহ্য চালু রাখার জন্য জীবনব্যবস্থা এমন হওয়া দরকার যে বেশ কিছু মানুষ গল্প-বলিয়ের গুণটি অর্জন করেন ও তাঁদের তারিফ করার মতো মানুষের কাছে সময় ও আগ্রহ থাকে। গল্প করা ও গল্প-বলার প্রথা বাঙালির সমাজে প্রাচীন। আমাদের চণ্ডীমণ্ডপের বা কথকতার বা পালাগানের আসরে তার পরিচয় আছে। পরিবারের মধ্যেই মানুষ ছিলেন যাঁরা গল্প শোনাতেন। আমরা এক বৃদ্ধ আত্মীয়ের কাছে আমি ও আমার বোন মুগ্ধ হয়ে পারিবারিক গল্প শুনতাম। ব্যাপারটা সম্পূর্ণ নির্ঝঞ্ঝাট ছিল না কারণ গল্পে-গল্পে কিছু পারিবারিক কেলেংকারির কথাও এসে যেত। ছোটদের যা শুনতে মানা। বড়রা সন্ত্রস্ত হয়ে উঠতেন, বিশেষতঃ বংশ গৌরবের দাবিদার পুরুষমানুষেরা। বাড়ি

বৌ-দের – মা, জ্যেঠিমাদের – মধ্যে কিন্তু উঠতো চাপা গুঞ্জন। ছেলেমেয়েদের কান তা কখনোই সম্পূর্ণ এড়াতে পারতো না। কিন্তু গল্পের চরিত্রই ছিল এই রকম। ঘটনা যেন সবসময়েই অর্ধ-প্রকাশিত, যা প্রকাশ হতো না তার অস্তিত্ব থাকতো গুঞ্জনে, গুজবে, কানে-কানে বলা ফিসফিসানি আলোচনায়। ইতিহাসের বিজ্ঞানের আলো সেখানে সম্পূর্ণ পৌঁছোয় না।

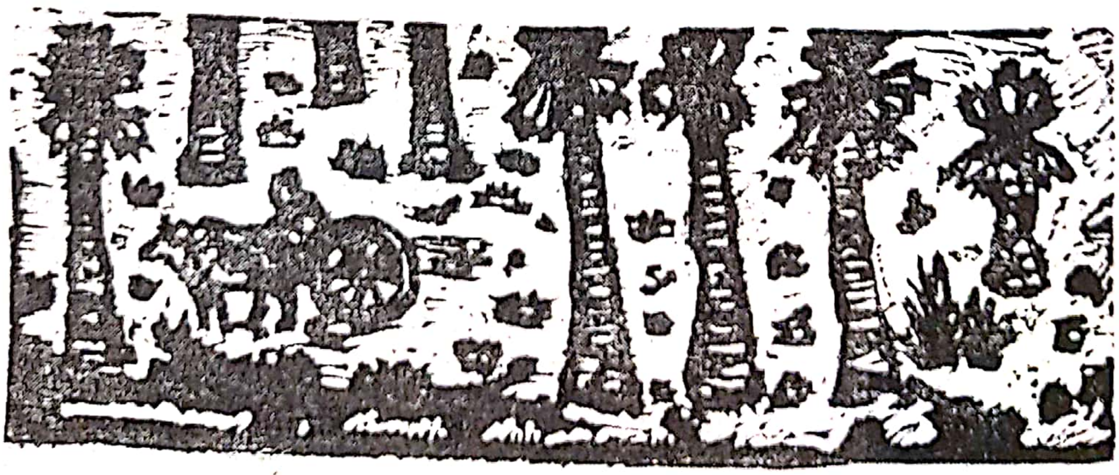
এই মুখে-মুখে গল্প বলার ট্র্যাডিশন ও ছাপার অক্ষরে গল্প বলার চেষ্টা, এই দুই ধারা মিলে মিশেই যেন জন্ম হয়েছিল সেই ধরনের রচনা যাকে আমরা "রম্যরচনা" বলে থাকি। এখানে সৈয়দ মুজতবা আলি, নলিনীকান্ত সরকার, বিনয় সরকার, বিপিনবিহারী গুপ্ত; কুমারপ্রসাদ মুখোপাধ্যায়, রাধাপ্রসাদ গুপ্ত, হাবুল সান্যাল প্রভৃতির নাম মনে পড়ে। এঁদের লেখা কতো গল্প আবার 'চুটকি' হয়ে মানুষের জিহ্বা আশ্রয় করে বেঁচে আছে। এইরকম দেখা গল্প-বলিয়েদের মধ্যে চিন্মোহন স্নেহানবীশের কথা আমার ব্যক্তিগত স্মৃতিতে উজ্জ্বল হয়ে আছে।

এবারে আমার তৃতীয় উপপাদ্যের কথা বলি। এটি ইতিহাস ও গল্পের (ancedote) এর পার্থক্য নিয়ে। ঐতিহাসিক অতীত বিষয়ে যৌক্তিক ও সত্যসন্ধানী। গল্প মানেই অসত্য, তা নয়। কিন্তু গল্পের সত্যাসত্যবিচার নিয়ে অতো মাথাব্যথা নেই। কারণ গল্প-ভিত্তিক যে অতীতচারণ তার মূল উদ্দেশ্য তথ্যের আহরণ নয়; বরং রসগ্রহণ বলা যেতে পারে। গল্পের পাঠক বা শ্রোতাকে "সহৃদয়" হতে হয়, নইলে গল্পো জমে না। আমাদের গল্প করা, anecdote বলা, স্মৃতি-মন্থন একধরনের সামাজিক সুখ। 'সুখ' বলে তাকে আমি খাটো করছি না। হয়তো নিছক 'সুখ' বা 'বিনোদন' হিসেবে দেখলে একটু ভুল-ই দেখা হয়। রাণী চন্দ যখন "আমার মায়ের বাপের বাড়ি"র কথা লিখেছিলেন, রবীন্দ্রনাথ তাঁকে অপ্রিয় কথা বর্জন করে যাতে মানুষের মনে ভালো-লাগার প্রলেপ পড়ে, তাই লিখতে উপদেশ দিয়েছিলেন। আসলে গল্প-ভিত্তিক অতীতচারণ আমাদের জীবনচর্যার অঙ্গ। আমরা যখন রবীন্দ্রনাথের ব্যক্তিগত শোক-দুঃখের গল্পগুলি পড়ি, তখন তা যেমন আমাদের মনে শান্ত ও করুণ রসের সঞ্চার করে, তেমনি আশুতোষের কি বিবেকানন্দের অনেক গল্পে আমাদের মন বীর রসে পূর্ণ হয়। গল্পের মাধ্যমে যে স্মৃতি তা আমাদের কাঁদায়, হাসায়, ক্রুদ্ধ বা শান্ত করে – এক কথায়, জীবনবোধের সন্ধান দেয়। এই স্মৃতিবন্ধন নস্টালজিয়া নয়,

Scanned with CamScanner

এ বেঁচে থাকার উপায়।

পরিশেষে প্রশ্ন ওঠে : বিশ্বায়নের মুখে দাঁড়িয়েও কি বাঙালি ভদ্রলোক এই স্মৃতির ঐতিহ্যকে বাঁচার উপায় হিসেবে ব্যবহার করতে পারবেন ? ancedote বলার যে পাবলিক কালচার, তাতে গপ্পো করার সময় প্রয়োজন। যে ধনতান্ত্রিক আধুনিকতা গল্পের আয়োজন জীবনের নানা স্তরে বজায় রাখতে দিয়েছে, তা নিশ্চয়ই আজকের অর্থনীতিবিদ্‌দের বিচারে inefficient ছিল ? নইলে কলেজে, হাসপাতালে, আপিসে, কারখানায় – সব জায়গাতেই 'আড্ডা'র ট্র্যাডিশন গজিয়ে উঠলো কী ভাবে ? পশ্চিমি ধাঁচের ধনতন্ত্র যদি সত্যিই দেশে আসে – এবং তাতে যদি বাঙালির আর্থিক স্বাচ্ছন্দ্য বাড়ে, খুশি হবো। কিন্তু তার একটি দাম দিতে হবে : সময়ের টিকি তখন মূলধনের ও মুনাফার হাতে বাঁধা থাকবে। হয়তো এই anecdotal স্মৃতির বদলে ইতিহাস, জীবনী এই সব আসবে। কিন্তু এই ভবিষ্যৎ একটি কল্পনামাত্র - কলকাতার প্যারিস-নিউইয়র্ক হতে এখনো দেরি আছে। কিন্তু মানুষের জীবনের ওপর ধনতান্ত্রিক চাপ বাড়ছে, সন্দেহ নেই। নতুন মিডিয়ার – টেলিভিশন, ভিডিও, সিনেমা, ইন্টারনেট - প্রাবল্যও টের পাওয়া যায়। একদিন যেমন মৌখিকভাবে anecdotal গল্প বলার ট্র্যাডিশন পুনর্জন্ম লাভ করেছিল – সাহিত্যের রম্যরচনায়, তেমনি হয়তো বাঙালির হাতে ক্যামেরাও একদিন খণ্ডকাহিনীর একটি ঘরানা তৈরি করবে। আমি তো 'হিন্দু'-ট্র্যাডিশনে বড় হয়েছি। তাই ভাবি, যা যায়, তাই আবার অন্য চেহারায় ফিরে আসে। শুধু চোখকে শেখাতে হয় কী করে সেই হারাধন চিনে নিতে হবে !



শিবাদিত্য সেন। জন্ম ১৯৫২, শান্তিনিকেতন। সিউড়ি বিদ্যাসাগর কলেজে অর্থনীতির অধ্যাপক।

তড়িৎ রায় চৌধুরী। জন্ম ১৯৭৬, বর্ধমান। পাঠভবন, বিশ্বভারতীতে বাংলা ভাষার অধ্যাপক।

পারভেজ কবীর। জন্ম ১৯৮২, সাঁইথিয়া। শিল্প ইতিহাস বিভাগ, এম এস বিশ্ববিদ্যালয়, বরোদায় স্নাতোকোত্তর শ্রেণীর ছাত্র।

সঞ্চয়ণ ঘোষ। জন্ম ১৯৭০, কলকাতা। কলাভবন বিশ্বভারতীতে চিত্রকলা বিভাগের অধ্যাপক।

শিবাজী বন্দ্যোপাধ্যায়। জন্ম ১৯৫৪, কলকাতা। তুলনামূলক সাহিত্য, যাদবপুর বিশ্ববিদ্যালয়ের অধ্যাপক। বর্তমানে Senior Fellow in Cultural Studies, Centre for Studies in Social Sciences, কলকাতা।

তীর্থঙ্কর রায়। জন্ম ১৯৬০, কলকাতা। গোখলে ইনস্টিট্যুট্ অফ পলিটিক্স এন্ড ইকনমিক্স, পুনায় অর্থনীতি ও ইতিহাসের অধ্যাপক। বর্তমান প্রবন্ধ লেখার সময় ইয়েল বিশ্ববিদ্যালয়ে কর্মরত।

সুপ্রিয় ঠাকুর। জন্ম ১৯৩৮, কলকাতা। প্রাক্তন অধ্যক্ষ, পাঠভবন, বিশ্বভারতী।

আলপনা রায়। জন্ম ১৯৪৮, শান্তিনিকেতন। বিদ্যাভবন, বিশ্বভারতীতে বাংলা ভাষার অধ্যাপক।

রমিত রায়। জন্ম ১৯৬৪, কলকাতা। বিদ্যাভবন, বিশ্বভারতীতে জার্মান ভাষার অধ্যাপক।

পুলক দত্ত। জন্ম ১৯৫৭, শান্তিনিকেতন। কলাভবন, বিশ্বভারতীতে গ্রাফিক্স্ বিভাগের অধ্যাপক।

সৌমিক নন্দী মজুমদার। জন্ম ১৯৬৬, কলকাতা। কলাভবন, বিশ্বভারতীতে শিল্প ইতিহাস বিভাগের অধ্যাপক।

দীপেশ চক্রবর্তী। জন্ম ১৯৪৮, কলকাতা। শিকাগো বিশ্ববিদ্যালয়ে ইতিহাস ও দক্ষিণ এশিয়া বিভাগের Lawrence A. Kimpton Distinguished Service Professor।

Scanned with CamScanner

Scanned with CamScanner

Scanned with CamScanner

Scanned with CamScanner

শিল্পী বিনোদবিহারী মুখোপাধ্যায়ের জন্মশতবর্ষ উপলক্ষে
কলাভবন নানান অনুষ্ঠানের উদ্যোগ নিয়েছে - বাংলা প্রবন্ধ সংকলন তারই মধ্যে একটি।
বিনোদবিহারী তাঁর সমস্ত সক্রিয় জীবন জুড়ে আন্তরিক ভাবে অনুধাবন করতে চেয়েছেন সমস্ত বিশ্বের
শিল্পচর্চার গতিবিধি। শুধু তাই নয়, বাংলা ভাষায় তা লিপিবদ্ধ করেছেন বিভিন্ন সময়ে লেখা অজস্র প্রবন্ধে।
সেই প্রক্রিয়ায় তৈরি হয়েছে মূল্যবান একটি শিল্পতত্ত্ব আর নিরাসক্ত স্বতন্ত্র এক বাচনভঙ্গী।
বাংলায় শিল্পালোচনার ক্ষেত্রে বিনোদবিহারীর অবদান খুবই গুরুত্বপূর্ণ ও মূল্যবান বলে আমরা মনে করি।

এই সংকলনের প্রথম অংশে রইল বিনোদবিহারী সংক্রান্ত কিছু লেখা।
দ্বিতীয় অংশে রইল সংস্কৃতি জগতের বিভিন্ন উপাদান সংক্রান্ত আলোচনা।
বিভিন্ন সময়ে বিভিন্ন উপলক্ষে আঁকা বিনোদবিহারীর কিছু ছবি দিয়ে সাজানো হল এই বই।
আমাদের এই উদ্যোগ যদি বাংলা ভাষায় সংস্কৃতি আলোচনার ধারাকে সজীব রাখতে সাহায্য করতে পারে
তাহলে সেই হবে বিনোদবিহারীর প্রতি আমাদের শ্রদ্ধা জ্ঞাপন।

Scanned with CamScanner